বৈষ্ণব প্রদীপ ৫

বৈষ্ণব ধর্মের বহু প্রশ্নের উত্তর সম্বলিত

শ্রী মনোরঞ্জন দে

বৈষ্ণব প্রদীপ

(বৈষ্ণব ধর্মের বহু প্রশ্নের উত্তর সম্বলিত)

পঞ্চম খণ্ড

বৈষ্ণব প্রদীপ

(বৈষ্ণব ধর্মের বহু প্রশ্নের উত্তর সম্বলিত)

পঞ্চম খণ্ড

শ্রী মনোরঞ্জন দে

সূর্যোদয়

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ২০১২

প্রকাশক
শ্রী মৃত্যুঞ্জয় পাল
সূর্যোদয়
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবা. ০১৯১২ ৫২৬৫৫৪
০১৬৮১৬৫১৩৫৫

কম্পোজ
বাংলাবাজার কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড ঢাকা ১১০০

ভিক্ষা মূল্য : ৩০.০০ টাকা

উৎসর্গ

আমার অন্যতম শিক্ষাগুরু
পরম পূজ্যপাদ বৈষ্ণব মহাজন
শ্রীল ভক্তিচারু স্বামী
মহারাজ-এর করকমলে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বৈষ্ণব প্রদীপ বইটির পঞ্চম খণ্ডের অর্থানুকূল্য করেছেন সুদূর আমেরিকা প্রবাসী ভক্তপ্রবর শ্রী অসীম দে। তার পরিবারের সবার উপর শ্রীশ্রী গৌর-নিতাই-এর কৃপা বর্ষিত হউক-এই কামনা রইল।

লেখকের বইসমূহ

১. বৈষ্ণব সম্প্রদায়
২. বৈষ্ণব নামধারী অপ-সম্প্রদায়
৩. দ্বাদশ গোপাল চৌষট্টী মহান্ত
৪. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তর্ধান লীলা
৫. শ্রী শ্রী রাধা তত্ত্ব
৬. শ্রী নৃসিংহদেব
৭. বৈষ্ণব প্রদীপ : ১ম খণ্ড
৮. বৈষ্ণব প্রদীপ : ২য় খণ্ড
৯. বৈষ্ণব প্রদীপ : ৩য় খণ্ড
১০. বৈষ্ণব প্রদীপ : ৪র্থ খণ্ড
১১. বৈষ্ণব প্রদীপ : ৫ম খণ্ড
১২. বৈষ্ণব প্রদীপ : ৬ষ্ঠ খণ্ড
১৩. বৈষ্ণব প্রদীপ : ৭ম খণ্ড
১৪. বৈষ্ণব প্রদীপ : ৮ম খণ্ড
১৫. বৈষ্ণব প্রদীপ : ৯ম খণ্ড
১৬. বৈষ্ণব প্রদীপ : ১০ খণ্ড

পরবর্তী বই

১. মহাপ্রভুর বাল্যলীলা
২. মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলা
৩. হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র
৪. মহাভারতের যুগে সেনাবাহিনীর গঠন কাঠামো, যুদ্ধাস্ত্র এবং যুদ্ধকৌশল
৫. সর্বোত্তম অর্থনীতিবিদ শ্রীকৃষ্ণ
৬. সর্বোত্তম রাজনীতিবিদ শ্রীকৃষ্ণ

লেখকের নিবেদন

প্রথমেই আমার পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্ত্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ-এর শ্রীচরণকমলে শতকোটি দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করছি।

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিবেদান্ত স্বামীন ইতি নামিনে ॥
নমস্তে সারস্বতে দেবং গৌরবাণী প্রচারিণে।
নির্বিশেষ শূন্যবাদী পাশ্চাত্যদেশ তারিণে ॥

সনাতন ধর্ম অত্যন্ত ব্যাপক এবং বিশাল। এই ধর্মের মধ্যে বিশ্বের সবকিছুই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নিহিত আছে। বেদ, উপনিষদ, ভগবদ্গীতা, অষ্টাদশ পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থে সব ধরনের জ্ঞানই অর্ন্তনিহিত আছে। কিন্তু এতসব গ্রন্থ বেশিরভাগ লোকের পক্ষেই পড়া, বোঝা এবং আত্মস্থ করা সম্ভব নয়।

একথা সত্য ব্যক্তিগতভাবে আমারও সব ধরনের বৈদিক শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ করার সুযোগ হয় নাই। যতটা সম্ভব পাঠ করেছি, তবে এখনও সব আত্মস্থ করার দুর্লভ সৌভাগ্য অর্জন করতে পারিনি। এজন্য এখনও পাঠ করে চলেছি। এই প্রক্রিয়ায় যে সামান্য জ্ঞান লাভ করেছি তার ফসল এই বইটি। আপাততঃ দশ খণ্ডে বিভক্ত এই বইতে দুই হাজার প্রশ্ন ও তার উত্তর সন্নিবেশ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে বইটির আরও

পরিবর্ধন হতে পারে। তবে এই বইতে বেশিরভাগ প্রশ্ন ও উত্তর বৈষ্ণব ধর্মের আলোকে করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, এই বইটি আমার সৃষ্ট কিছু নয়। বিভিন্ন প্রামাণিক পুথি-পুস্তকের সহায়তায় এর সংকলন করা হয়েছে, ক্ষেত্রবিশেষে হুবহু তথ্য তুলে ধরেছি। তবে এই বইতে কোন প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে কারও কোন সংশয় এবং সন্দেহ হলে উপযুক্ত তথ্য এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিয়ে প্রকাশকের কাছে পত্র লিখতে পারেন যাতে পরবর্তী সংস্করণে ভুল সংশোধন করা যায়। কারণ আমাদের লক্ষ্য হলো যে-কোন প্রশ্নের শাস্ত্রীয়ভাবে নির্ভুল উত্তর প্রদান।

যেসব গৌড়িয় ভক্ত এই দীন-অভাজনকে এই ধরনের একটি বই সংকলনের জন্য কৃপাশীর্বাদ করেছেন তাদের মধ্যে ভাগবত প্রবর শ্রী প্রেমরতন গোস্বামী, ভাগবতপ্রবর শ্রী মুকুল পদ মিত্র, ভক্তপ্রবর শ্রী দীপক দেবনাথ, ভক্তপ্রবর শ্রীজয় দেবনাথ, ভাগবত প্রবর শ্রী দীপক গুপ্ত, ভক্তপ্রবর শ্রী কালিদাস পাল (এ্যাডভোকেট), ভক্তপ্রবর শ্রী প্রণব চৌধুরী, ভক্তপ্রবর শ্রী সত্যরঞ্জন সরকার, ভক্তপ্রবর শ্রী হরিপদ দত্ত, ভক্তিন শ্রীমতি লক্ষ্মী রাণী দত্ত, ভক্তপ্রবর শ্রী সুবীর পাল, ভক্তপ্রবর শ্রী সঞ্জয় মোদক, ভক্তপ্রবর শ্রী চন্দন পোদ্দার, ভক্তপ্রবর শ্রী নবকুমার শর্মা, ভক্তপ্রবর শ্রী কানাই বিশ্বাস, ভক্তপ্রবর শ্রী মিঠুন দাস, ভক্তপ্রবর শ্রী কৌশিক দাসাধিকারী এবং ভক্তপ্রবর শ্রী সনাতন দাস অন্যতম।

বৈষ্ণব দাসানুদাস
মনোরঞ্জন দে

প্রশ্ন : ৬৯৮ ॥ জীবদেহে পরমাত্মারূপে যিনি বিরাজ করেন তিনি কে?

উত্তর : সংক্ষেপ উত্তর হল তিনি ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু। শ্রীমদ্ ভাগবত (১০/৮৮/৪) অনুযায়ী মায়ার সত্ত্বগুণ মিশ্র হলে তার মধ্যে যে বিশুদ্ধ সত্ত্বাংশ আছে—তাতে উদিত গুণাবতারই হলেন এই বিষ্ণু। তিনি গুণাতীত, মায়ার অতীত, পরমেশ এবং মায়াধীশ। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্য লীলায় বলা হয়েছে—

পালনার্থে স্বাংশ বিষ্ণুরূপে অবতার।
সত্ত্ব গুণ দৃষ্টান্ত তাতে গুণ-মায়া পার ॥
স্বরূপ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণসম প্রায়।
কৃষ্ণ অংশী তিঁহো অংশ বেদে হেন গায় ॥

প্রশ্ন : ৬৯৯ ॥ সৃষ্টি কর্তা ব্রহ্মা সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর : গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভিকমল থেকে আবির্ভূত রজোগুণ সম্পন্ন হলেন সৃষ্টি কর্তা ব্রহ্মা। ব্রহ্মা দুই প্রকার। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্য লীলায় বলা হয়েছে—

ভক্তি-মিশ্র কৃত পুণ্যে কোন জীবোত্তম।
রজোগুণে বিভাবিত করি তার মন।
গর্ভোদকশায়ী দ্বারা শক্তি সঞ্চারী।
ব্যষ্টি সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মা রূপ ধরি ॥

কোন কল্পে যদি যোগ্য জীব নাহি পায়।
আপনি ঈশ্বর তবে অংশে ব্রহ্মা হয় ॥

উপরোক্ত পয়ারসমূহের তাৎপর্য্য হল নিম্নরূপ—

১. কোন কল্পে (জড় জগতের ৪৩২ কোটি বছরে এক কল্প হয়) উপযুক্ত জীবে ভগবৎ শক্তির আবেশ হলে সেই জীব ব্রহ্মা হয়ে সৃষ্টি কার্য করেন। এভাবে ব্রহ্মাতে ভগবানের শক্তি সঞ্চার হয় বলে তাঁকে আবেশ-অবতার বলা যায়। আবেশ-অবতার ব্রহ্মাতে রজোগুণের যোগহেতু তাঁকে বিষ্ণুর সমান ধরা যায় না।

২. যে কল্পে উত্তম জীব না পাওয়া যায় সেই সময় বিষ্ণু স্বয়ং ব্রহ্মা হন। সেই কল্পে ব্রহ্মাকে বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন দর্শন করতে হবে।

অতএব তত্ত্বত: ব্রহ্মা সাধারণ জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সাক্ষাৎ ঈশ্বর নন।

প্রশ্ন : ৭০০ ॥ শিবতত্ত্ব সম্পর্কে কিছু জানতে চাই।

উত্তর : অনেকে বলেন শিবই ভগবান। এক অর্থে এই কথা সত্য। কারণ শিবের ঈশ্বরতা গোবিন্দের ঈশ্বরতার অধীন। বিষ্ণুর সাথে ভেদ এবং অভেদ তত্ত্ব। মায়ার সঙ্গে বিকার লাভ করায় ভেদ এবং চিৎ-বিলাসের আশ্রয় জাতীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব হওয়ায় বিকার-রহিত হয়ে স্বয়ং বিষ্ণুর সাথে অভেদ।

বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভু—ইত্যাদি শাস্ত্রবচনের তাৎপর্য হল শম্ভু নিজের কাল শক্তি দ্বারা গোবিন্দের ইচ্ছানুসারে দুর্গাদেবীর সাথে যুক্ত হয়ে তমোগুণের সাহায্যে সংহার কাজ করেন। সংহার কর্তারূপে শিব গুনাবতার। আবার জীবদের অধিকার ভেদে ভক্তি লাভের জন্য ধর্ম-শিক্ষা দেন। কোন কল্পে সর্বোত্তম পুণ্যবান জীবও সংহার কর্তা শিব হন। আবার কোন কল্পে এরূপ জীব না পাওয়া গেলে স্বয়ং ভগবান নিজেই শিবরূপ ধারণ করে সংহার কাজ পরিচালনা করেন। সংহার কর্তা হিসাবে শিব তমোগুণের অবতার। কিন্তু যিনি বৈকুণ্ঠ ধামের অন্তর্গত শিবলোকে সদাশিবরূপে বিরাজিত তিনি গুন-অবতার নন। তিনি নির্গুন এবং নারায়ণের মত স্বয়ং রূপ শ্রী কৃষ্ণেরই বিলাস মূর্তি বা কায়ব্যুহ। এই সদাশিব গুন-অবতার শিবের অংশী বা গোপালীনি শক্তি। কাজেই ব্রহ্মা থেকে শ্রেষ্ঠ এবং বিষয় আশ্রয়ের অলম্বনত্বে একত্ব হেতু বিষ্ণুর সাথে অভিন্ন।

শিব মায়া শক্তি-সঙ্গী তমোগুণাবেশ।
মায়াতীত গুণাতীত বিষ্ণু পরমেশ।

প্রশ্ন : ৭০১ ॥ আজকাল কিছু লোক শ্রী ভগবানের অপ্রাকৃত লীলার পর্য্যন্ত দোষ অনুসন্ধান করে। এই বিষয়ে কিছু বলুন।

উত্তর : জীব বর্হিমুখ হয়ে গুরু বৈষ্ণবের শ্রী চরণে মহাঅপরাধ করে ফেলে। এই সীমা যখন অত্যন্ত বাড়ে তখন সে সাক্ষাৎ শ্রী ভগবানের অপ্রাকৃত লীলারও দোষ অনুসন্ধানে লিপ্ত হয়। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে উল্লেখিত শ্রী মাধবেন্দ্র পুরী পাদের শিষ্য শ্রী রামচন্দ্র পুরী। তিনি সব সময়ই মহাপ্রভুর দোষ খুজে বেরাতেন। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতকার এই সম্পর্কে বলেন—

যাঁহা গুন শত আছে তাহা না করে গ্রহণ।
গুণমধ্যে ছলে করে দোষ আরোপণ

এইসব পাষণ্ডীদেরকে জন্ম জন্ম নিরয়গামী হতে হবে। এরা কখনই হরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা কোন জন্মেই লাভ করতে পারবে না।

প্রশ্ন : ৭০২ ॥ শ্রী কৃষ্ণের মামা কংসের মাতার নাম কি? তার নীতি কিরূপ ছিল?

উত্তর : কংসের জননীর নাম পদ্মা। তিনি খুবই প্রাচীনা ছিলেন। এই পদ্মা প্রাকৃত ইন্দ্রিয় জ্ঞান নিয়ে সব সময় কথা বলতেন। পদ্মা এক সময় বলেছিল, কৃষ্ণতো আমাদেরই লোক। বৃন্দাবনের গোপ-গোপিনীরা তাকে নিয়ে গোলমাল করছে। আমাদের লোক সকলকে বিরক্ত করছে। এর ঔষধ আমি জানি। গোপ-গোপীরা ৫ বছর বয়স পর্য্যন্ত কৃষ্ণকে খাইয়েছে এবং কৃষ্ণও তাদের গরু চরিয়েছে। তাই উভয় পক্ষের মধ্যে খোরাকী ও বেতন ধরে একটি হিসাব করে গোপদের যা

পাওনা হয় তোমরা দিয়ে দাও। তাহলে বৃন্দাবনের লোক সকল আর আমাদেরকে বিরক্ত করবে না।

প্রশ্ন : ৭০৩ ॥ ভাগবত অলস লোকেরই আলোচ্য—এই রকম নাকি কোন শাস্ত্রে আছে?

উত্তর : ঋষি বাক্যে কোন প্রকার ভুল থাকতে পারে না। প্রাকৃত জ্ঞানের অধিকারী তথাকথিত কিছু পণ্ডিত ব্যক্তি ঋষি বাক্যের মূল উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে উপরোক্ত ধরনের কথা বলেন। **অত্রি ঋষির** লিখিত—

বৈদৈর্বিহীনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রং শাস্ত্রেনহীনাশ্চ পুরান-পাঠাঃ
পুরানহীনাঃ কৃষিণো ভবন্তি ভ্রষ্টাস্ততো ভাগবতা ভবন্তি—

এই শ্লোকটির অবৈধ এবং অপব্যাখ্যার সুযোগ নিয়ে ঐ সকল ব্যক্তি উপরোক্তরূপ মনে করেন। আসলে অত্রি ঋষি শ্লেষসহকারে যে ঐ সকল কথা বলেছেন, তাই এই সকল লোক বুঝতে না পেরে ভাগবত আলোচনা অলস লোকের আলোচ্য বিষয় বলে মনে করেন। যে ভাগবত আলোচনা এবং শ্রবণ করলে জীব মায়ার কবল থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারে—তা কি অলস লোকের আলোচ্য বিষয় হতে পারে? এইসব লোক খুবই দুর্ভাগা।

প্রশ্ন : ৭০৪ ॥ মানব জীবনের পক্ষে শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ কি?

উত্তর : কঠ-উপনিষদে বলা হয়েছে : শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ—এই দুইটি জিনিস মানুষকে আশ্রয় করে থাকে। কিন্তু যারা ধীর ব্যক্তি তাঁরা এই দুইটি তত্ত্ব ভালভাবে অবগত হয়ে একটিকে মুক্তির কারণ এবং অন্যটিকে বন্ধনের কারণ হিসাবে বিচার করেন। তারা প্রেয়ঃ পরিত্যাগ করে শ্রেয়ঃকে বরণ করে নেন। আর বিবেকহীন মন্দ লোকেরা যোগ—অর্থাৎ অলব্ধ বস্তুর লাভ ও ক্ষেম অর্থাৎ লব্ধ বস্তুর সংরক্ষণ—এই দুই ধরনের প্রেয়ঃকে প্রার্থনা করেন। এককথায় প্রেয়ঃ লাভে প্রয়াসী ব্যক্তিগণই জগতে বেশি। এরা ভগবানের সেবক হতে চান না। জড় সুখই তাদের কাম্য। আর শ্রেয়ঃ ব্যক্তিগণ ভগবৎ প্রেমের অভিলাষী হন।

প্রশ্ন : ৭০৫ ॥ বৈষ্ণবের মধ্যে নাকি তারতম্য আছে। তাহলে কিভাবে তাদের সেবা করবো?

উত্তর : যিনি যেমন বৈষ্ণব—অর্থাৎ যেমন ভক্তিপথ যাঁরা অবলম্বন করেছেন তাঁদের অধিকার বিচার করে কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম—এই যোগ্যতা অনুসারে সেবা করতে হবে। কনিষ্ঠ অধিকারীকে উত্তম অধিকারীর পাপ্য সম্মান দিলে বা মধ্যম অধিকারীর সাথে কনিষ্ঠের ন্যায় ব্যবহার করলে সেবা সুষ্ঠুভাবে হয় না। বৈষ্ণবকে আদর করতে হবে তাঁর বৈষ্ণবতার মাপকাঠিতে।

প্রশ্ন : ৭০৬ ॥ বৈষ্ণব চিনিব কিভাবে?

উত্তর : একমাত্র কৃষ্ণ ভক্তিই বৈষ্ণবতার লক্ষণ। শ্রী গুরুর চরণ আশ্রয়পূর্বক ভজন ক্রমে যে রস উদয় করতে পারা যায় তার নামই বৈষ্ণবতা। নিরপরাধে কদাচিৎ নাম হলেও তিনি বৈষ্ণব। সেরূপ নিরন্তর নাম হলে তিনি বৈষ্ণবতর হন। আর হ্লাদিনী শক্তির উদয় হলে তিনি বৈষ্ণবতম্ হন। শুদ্ধ নামপরায়ণ ব্যক্তিই শ্রী চৈতন্যের চরণে অনুগত বৈষ্ণব বলে খ্যাত। এককথায় যাঁর যে পরিমাণে শ্রী কৃষ্ণ নামে রতি হয়েছে তিনি ততদুর বৈষ্ণব।

প্রশ্ন : ৭০৭ ॥ অনন্য ভক্ত কাকে বলা যাবে?

উত্তর : যিনি অন্য সকল উপায় ত্যাগ করে একমাত্র শ্রী কৃষ্ণ নামকেই সর্বপ্রকারে আশ্রয় করেছেন, তিনিই অনন্য ভক্ত। শ্রী কৃষ্ণই আমার জীবনে, মরণে, শয়নে, স্বপনে একমাত্র কৃত্য—এরূপ একান্ত বিশ্বাস বা নিশ্চিত ধারণা তাঁর আছে। শ্রী হরিনাম ছাড়া আর ধর্ম নেই, গতি নেই—একথা তিনি জানেন। তাই তিনি শ্রী হরির নামকেই একমাত্র আশ্রয় করে থাকেন।

প্রশ্ন : ৭০৮ ॥ কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় বৈষ্ণব বা সাধু নামে পরিচিত ব্যক্তিও পাপকর্মে লিপ্ত হয়। তখনও কি তাদেরকে সাধু বা বৈষ্ণব বলা যাবে?

উত্তর : ভগবানে আশ্রিত ব্যক্তি সাধারণত কোন পাপকর্মে লিপ্ত হন না। তবে দৈবাৎ যদিও কোনরূপে কোন পাপ প্রবৃত্তি উপস্থিত হয়

তাহলেও শ্রীভগবানের নাম-মহিমা স্মরণেই আনুসঙ্গিকভাবে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে থাকে। শ্রীমদ্ ভাগবতে বলা হয়েছে : যিনি অনন্যভাবে ভগবানের পদকমলের আরাধনা করেন, এরূপ প্রিয় ভক্তের হৃদয়ে কখনো কোনরূপ বিকর্ম-প্রবৃত্তির উদয় হলেও তার হৃদয়ে অবস্থিত পরমেশ্বর শ্রী হরি সেই সকল বিনষ্ট করে দেন। শ্রী ভগবান গীতায় (৯/৩০) বলেছেন : যিনি আমাকে অনন্যচিত্ত হয়ে ভজন করেন, তিনি যদি সুদুরাচারীও হন, তথাপি তিনি সাধু বলেই মান্য যেহেতু তিনি উত্তম নিশ্চয় করেছেন।

প্রশ্ন : ৭০৯ ॥ বেদকে অপৌরুষেয় বলা হয়। এই অপৌরুষেয় দ্বারা কি বুঝানো হয়?

উত্তর : বেদকে অপৌরুষেয় বলা হয়। কারণ বেদ কোন পুরুষের দ্বারা রচিত হয় নাই। কোন পুরুষ দ্বারা সৃষ্ট কোন কিছু অনিত্য হয়। বেদ কোন পুরুষ দ্বারা কৃত বা রচিত হলে তা অনিত্য ও নানা ধরনের দোষযুক্ত হতো। বেদ ব্রহ্ম, আর ব্রহ্মই বেদ। শ্রীল ব্যাসদেব বেদ রচনা করেন নাই। তিনি কেবলমাত্র বেদের শাখা বিভাগমাত্র করেন।

প্রশ্ন : ৭১০ ॥ অনেকে বলেন শাস্ত্রে আছে মধু এবং কৈটভ নামে দুই দৈত্য নাকি বেদকে অপহরণ করেছিল? আসলে কি তাই?

উত্তর : আসলে মধু ও কৈটভ নামে দুইজন দৈত্য বেদাভিমানী দেবতাকে হরণ করেছিল। নতুবা যে বেদকে শ্রী ভগবান সবসময় তাঁর হৃদয়ে ধারণ করেন, যা নিত্য শব্দ রাশিরূপে ব্যক্ত, তা কিভাবে অপরে হরণ করতে পারে? কোন দৈত্যের কি তা অপহরনের ক্ষমতা আছে? আর পরিব্যক্ত নিত্য শব্দ রাশিরই বা আকর্ষণ কিরূপে সম্ভব? কাজেই মধু ও কৈটভ যে সব বেদ-অভিমানী দেবতাকে অপহরণ করেছিল শ্রী হয়গ্রীব অবতারে ভগবান মধু ও কৈটভকে বধ করে সে সব দেবতাকে ব্রহ্মার হাতে সমর্পণ করেছিলেন।

প্রশ্ন : ৭১১ ॥ বেদান্তসূত্র বা ব্রহ্মসূত্র কি?

উত্তর : বিভিন্ন উপনিষদের তাৎপর্য্য সহজ করার জন্য সমস্ত বেদান্তবাক্য সংগ্রহ করে প্রায় সাড়ে পাঁচশত সূত্র গঠন করে বেদান্ত সূত্রকে ব্রহ্মসূত্র বলে শ্রীল ব্যাসদেব নামকরণ করেন।

প্রশ্ন : ৭১২ ॥ শ্রুতি (বেদ) ও উপনিষদের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?

উত্তর : শ্রুতি হলেন ভগবানের উপদেশ—প্ররম্পরা প্রাপ্ত ভগবানের বাণী। আর উপনিষদ হলেন ঋষিদৃষ্ট। বেদান্তের মধ্যে যে যে ঋষি যে যে ভাগ দর্শন করেছিলেন সেই সেই ভাগ ঐ ঋষির নাম অনুসারে প্রসিদ্ধ। যেমন কঠ ঋষির নাম অনুসারে কঠোপনিষদ্ ইত্যাদি।

প্রশ্ন : ৭১৩ ॥ সব বর্ণ এবং আশ্রমে থাকা লোকদের জন্য কৃষ্ণ-ভজন কি অত্যাবশ্যক?

উত্তর : হ্যাঁ। যে লোক যে বর্ণ এবং আশ্রমেই থাকুন না কেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রী কৃষ্ণের সাধন ও ভজনই তার জন্য শ্রেয়ঃ। কেবলমাত্র স্বধর্মানুষ্ঠান মানুষকে রৌরব নরকের শাস্তি থেকে রেহাই দিতে পারে না। এই জন্যই শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিলেও সে রৌরবে পড়ি মজে ॥

প্রশ্ন : ৭১৪ ॥ ধর্মজ্ঞ ব্যক্তির কি কি পরিত্যাগ করা উচিত?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভাগবতে (৭/১৫/১২-১৪) শ্রীল নারদ মুনি বলেছেন ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি বিধর্ম, পরধর্ম, ধর্মাভাস, উপধর্ম এবং ছলধর্ম—এই পাঁচটি অধর্ম শাখাকে অধর্মের ন্যায়—অর্থাৎ নিষিদ্ধ বস্তুর মতো পরিত্যাগ করবেন। ধর্মবোধে কৃত হলেও যা স্বধর্মের বিরোধী হয় তাকে বিধর্ম বলা হয়। অন্যের উপদিষ্ট এবং অপরের অধিকারোচিত ধর্ম হল পরধর্ম। আর দম্ভযুক্ত ধর্ম হল পাষণ্ড ধর্ম। আবার নিজেকে জটা-ভস্ম ধারণ পূর্বক ধর্ম উপধর্ম। আর যা শব্দ মাত্রে কেবল ধর্মশব্দ ধারণ করে তার নাম ছলধর্ম। যেমন গরু-দান ধর্মীয় কর্তব্য এই কথা শুনে কেউ যদি অকর্ম্মন্য অথবা বুড়া গরু দান করে এবং এর দ্বারা ধর্মীয় বিধি-বিধান পালন করা হল বলে মনে করেন তবে তাকে ছলধর্ম বলে। নিজের খেয়াল-খুশিমত কল্পিত দেবতাদির পুজা করা হল ধর্মাভাস। বিজ্ঞ ব্যক্তি এসব পরিত্যাগ করবেন।

প্রশ্ন : ৭১৫ ॥ বিশ্বামিত্র মুনি কার পুত্র ছিলেন? তার মতো ঋষিও কেন স্বর্গের অপ্সরা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন?

উত্তর : বিশ্বামিত্র কুশবংশীয় কাণ্যকুজের রাজা গাঁধির পুত্র ছিলেন। তপস্যার বলে তিনি ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম নিয়েও ব্রাহ্মণ স্বভাব লাভ করেছিলেন। কিন্তু তিনি তপস্যার কারণে ঋষিত্ব লাভ করলেও একান্ত মনে হরি ভজন করেন নাই। ফলে পুষ্কর তীর্থে তপস্যারত অবস্থায়ও স্বর্গের অপ্সরা দর্শনে কামতাড়িত হয়েছিলেন।

প্রশ্ন : ৭১৬ ॥ ভক্তিপথে থাকার পরও কারো কি কখনো পতন হতে পারে?

উত্তর : না। ভক্তি পথে থাকলে পতনের কোন আশঙ্কা নেই। শ্রী শ্রী গুরু-গৌরাঙ্গের প্রতি নির্ভরতা থাকলে তাঁরাই ভক্তকে পতন থেকে রক্ষা করেন। ভক্তিপথে চলতে চলতে আগের কর্মফল হেতু পদস্থলন হতে পারে। কিন্তু কখনো পতন হয় না। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী রাজা পরীক্ষিতকে লক্ষ্য করে বলেছেন—

হে রাজন! ভাগবত-ধর্ম আশ্রয় করলে মানব কোনকালেও বিপন্ন হয় না এবং চক্ষু আবৃত করে ধাবমান হলেও কখনও তার পতন হয় না (শ্রীমদ্ ভাগবত ১১/২/৩৫)।

প্রশ্ন : ৭১৭ ॥ ভগবৎ ভক্তদের নাকি পতন হয় না। তাহলে চিত্রকেতু রাজা এবং ভরত মহারাজের মতো ভক্তের পতন হয়েছিল কেন?

উত্তর : এই পতন ভগবানের ইচ্ছাতেই হয়েছিল। এখানে নিজের জন্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে তাঁরা নিচু যোনিতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন মাত্র। কিন্তু ভক্তি পথ থেকে তাঁদের পতন হয় নাই। নতুবা চিত্রকেতু অসুর জন্মে বৃত্রাসুর হয়েও কিভাবে ইন্দ্রকে ভাগবত ধর্মের উপদেশ দিয়েছিলেন? শ্রী ভরত মহারাজ হরিনের দেহ পেয়েও ভগবানের চিন্তা করতেন। কাজেই ভক্তের পতন হয় না। কারণ শ্রী বৃত্রাসুর, শ্রী ভরত মহারাজ প্রমুখের উৎকৃষ্ট জন্ম থেকে বিচ্যুতি হলেও তাঁদের ভক্তিবাসনা নিঃশেষ হয় নাই।

প্রশ্ন : ৭১৮ ॥ অনেকেই বলেন, শাস্ত্রীয় বিষয়ে শ্রদ্ধা থাকা উচিত। এই শ্রদ্ধা বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : শ্রদ্ধা বলতে সাধারণ কথায় নির্ভরতা বুঝায়। কায়মনোবাক্যে অপকট আনুগত্যই শ্রদ্ধা। কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ ভক্তের প্রতি শ্রদ্ধাবানের সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকে। কাজেই শ্রী কৃষ্ণে ভক্তি করলে সব ধরনের কর্ম করা হয়—শাস্ত্রের এই কথার প্রতি দৃঢ় নিশ্চয়তার নাম বিশ্বাস। আর এই বিশ্বাসকেই শ্রদ্ধা বলে। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে তাই বলা হয়েছে—

শ্রদ্ধা-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব কর্ম কৃত হয় ॥

প্রশ্ন : ৭১৯ ॥ আজকাল যাদেরকে গুরু বলে দেখি তাদের প্রায় সবারই নামের শেষে গোস্বামী উপাধি দেখতে পাওয়া যায়। এরা কি সবাই প্রকৃত গোস্বামী?

উত্তর : গো শব্দের এক অর্থ ইন্দ্রিয়। আর স্বামী শব্দের অর্থ প্রভু। কাজেই যিনি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়সমূহ নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছেন তিনিই গোস্বামী। সংক্ষেপে বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ এবং উপস্থের বেগ—এই ছয়টি বেগ নিয়ন্ত্রণে যিনি সক্ষম হয়েছেন, তিনিই কেবলমাত্র নামের শেষে গোস্বামী উপাধি ধারণ করতে পারেন।

প্রশ্ন : ৭২০ ॥ প্রকৃত পক্ষে কারা নরকের যাত্রী হয়?

উত্তর : যে সব লোক ভগবানের কথা বলে না, স্মরণ করে না, মস্তক দ্বারা শ্রী হরি-গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্মে নমস্কার করে না তারাই মূলত নরক পথের যাত্রী হয়। শ্রীমদ্ ভাগবতে (৬/৩/২৯) শ্রী যমরাজ নিজের দূতগণকে বলেছেন : যে সকল পাপীর জিহ্বা একবারও কৃষ্ণের নাম ও গুণ কীর্তন করে না, যাদের মন একবারও তাঁর পাদপদ্মের স্মরণ করে না, যাদের মস্তক একবারও তাঁর চরণে প্রণত হয় না, যারা কখনোও বৈষ্ণব-ব্রতাদি পালন করে না, তাদেরকেই তোমরা আমার কাছে নিয়ে আসবে।

প্রশ্ন : ৭২১ ॥ শ্রী গঙ্গার কিছু মাহাত্ম্য বর্ণনা করুন।

উত্তর : সংক্ষেপে শ্রী গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হল।

শ্রী গঙ্গা বৈকুণ্ঠ-বস্তু। শ্রী গঙ্গা সাক্ষাৎ হরিচরণামৃত। এই গঙ্গার নাম শ্রবণ করলে এবং গঙ্গার উপর দিয়ে যে বাতাস বয়ে যায় তা গায়ে লাগলে হরিভক্তি হয়। ভগবানের ভক্তগণ গঙ্গা দর্শন, স্পর্শ, স্তুতি, প্রণাম এবং গঙ্গায় স্নান করে গঙ্গার সেবা করেন। গঙ্গার জল পান ও গঙ্গা-স্নান করলে জীব সংসার থেকে মুক্ত হয়ে শুদ্ধ-ভক্তি লাভের সৌভাগ্য পায়। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীমন মহাপ্রভু বলেছেন—

দারু-ব্রহ্ম রূপে সাক্ষাৎ শ্রী পুরুষোত্তম।
ভাগীরথী হন সাক্ষাৎ জলব্রহ্ম-সম ॥

গঙ্গার মাহাত্ম্য অল্পকথায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। শ্রী চৈতন্য ভাগবতে গঙ্গাদেবীর মহিমা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা থেকে কিছু অংশ নিচে উল্লেখ করা হল।

প্রেমরস স্বরূপ তোমার দিব্যজল।
শিব সে তোমার তত্ত্ব জানেন সকল ॥
সকৃৎ তোমার নাম করিলে শ্রবণ।
তার বিষ্ণু ভক্তি হয়, কি পুণঃ ভক্ষণ ॥
তোমার প্রসাদে সে শ্রী কৃষ্ণ হেন নাম।
স্ফুরয়ে জীবের মুখে, ইথে নাহি আন ॥
... ...
পবিত্র তারিতে সে তোমার অবতার।
তোমার সমান তুমি বই নাহি আর ॥

প্রশ্ন : ৭২২ ॥ গৌরপার্ষদ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি কেন গঙ্গা-স্নান করতেন না?

উত্তর : গৌর পার্ষদ শ্রী পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি পায়ের স্পর্শ হবে—এই ভয়ে গঙ্গাস্নান করতেন না। এমনকি সাধারণ লোকজন গঙ্গায় প্রাকৃত জলবুদ্ধি করে দাত মাজন, কুলকুলা, গাত্র-মার্জন, কেশ সংস্কার ইত্যাদি করতো বলে তিনি দিনের বেলা গঙ্গা-দর্শন পর্যন্ত করতেন না।

প্রশ্ন : ৭২৩ ॥ সীতাকে রাবণ হরণ করার পর শ্রী রামচন্দ্র ক্রন্দন করেছিলেন। শ্রী ভগবানের পক্ষে এই আচরণ কি শোভনীয়? কারণ তিনিতো আমাদের মতো জড়বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ ছিলেন না।

উত্তর : বৈষ্ণব মহাজন শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদ শ্রীমদ্ ভাগবতের ৯/১০/১০ শ্লোকের **সারার্থদর্শিনী** টীকায় এই বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন তা নিচে উল্লেখ করা হল।

শ্রী রামচন্দ্রের অলক্ষ্যে অধম রাবণ কর্তৃক সীতা অপহরণ হলে প্রেমবতী প্রিয়ার জন্য তাঁর যে বিরহ উৎপন্ন হয় তাহা শৃঙ্গার (অনুজ্জল) রসগত। সেই বিপ্রলম্ভ রস আস্বাদনেই অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের সাথে যে বিলাপ, মুচ্ছা, উন্মাদ ইত্যাদি ভাবের উদয় হয় তাই প্রকাশপূর্বক বনে ভ্রমণ করেছিলেন। আবার এই ধরনের লীলা দ্বারা সাধারণ লোকদের কাছে স্ত্রী-সঙ্গীদের পরিণাম যে দুঃখপ্রদ তাই প্রচার করেছিলেন। সীতা হরণের জন্য ক্রন্দন তাই বস্তুতপক্ষে সত্য নয়।

শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ তাঁর **ক্রমসন্দর্ভ** টীকায় বলেন যে সীতা-বিরহজনিত দুঃখ লীলা-মাধুর্য্যের অর্ন্তগত। প্রকৃতপক্ষে এতে কোন প্রাকৃত দোষ স্পর্শ করে নাই।

প্রশ্ন : ৭২৪ ॥ রাবণ কি শ্রী রামচন্দ্রের স্বরূপ শক্তি সীতাদেবীকে সত্যি সত্যিই হরণ করেছিল?

উত্তর : সীতাদেবীকে হরণ করার জন্য রাবণ তাঁর নিকটে আসলে সীতাদেবী নিজের মায়া-প্রতিকৃতি রাবণের সম্মুখে স্থাপন করে কৈলাসে গমন করেন এবং সেখানে হর-গৌরী দ্বারা সেবা পুঁজা লাভ করেন। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীমন মহাপ্রভু বলেন—

"প্রভু কহে,—এ ভাবনা না করহ আর।
পণ্ডিত হঞা কেনে না করহ বিচার ॥
ঈশ্বর-প্রেয়সী সীতা চিদানন্দ মূর্ত্তি।
প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের তাঁরে দেখিতে নারি শক্তি ॥
স্পর্শিবার কাজ আছুক, না পায় দর্শন ॥
সীতার আকৃতি মায়া হরিল রাবণ ॥

রাবণ আসিতেই সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল ।
রাবণের আগে মায়া-সীতা পাঠাইল ॥
অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর ।
বেদ-পুরানেতে এই কহে নিরন্তর ॥

শাস্ত্র অনুযায়ী রাবণকে দেখে সীতাদেবী অগ্নির শরনাপন্ন হন । অগ্নি তখন সীতাকে পার্বতীর স্থানে নিয়ে যান । তখন মায়া-সীতা রাবণ হরণ করেন ।

প্রশ্ন : ৭২৫ ॥ সুগ্রীবের স্বার্থের জন্য ভগবান শ্রী রামচন্দ্র নিরপরাধ বালীকে বধ করেছেন । ভগবানের পক্ষে এই কার্য্য কি নিন্দনীয় নয়?

উত্তর : মহাভারত তাৎপর্য্যে (৬/১০-২০) বর্ণিত হয়েছেঃ বালী আমার (শ্রী রামচন্দ্রের) ভক্ত, সে আমাকে দেখামাত্রই নিশ্চয়ই আমার পদতলে পতিত হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । পদানত ব্যক্তিকে বধ করা উচিত নয় । আবার সুগ্রীব দ্বারা প্রার্থিত হয়ে বালীবধেরও প্রতিজ্ঞা করেছি । আগে প্রণতজনের বধকার্য্য অভিপ্রেত নয় এবং প্রণতজন বধ্যও নয় । এই জন্য রামচন্দ্র বালীর অলক্ষ্যে থেকে তাকে বধ ও পরমাগতি প্রদান করেন ।

প্রশ্ন : ৭২৬ ॥ বদরিকাশ্রমে ভগবান শ্রী হরির নর-নারায়ণরূপী বিগ্রহ কিরূপ?

উত্তর : ভগবান শ্রী হরির নর-নারায়ণরূপী বিগ্রহ যুগলের মধ্যে একটি হল শুক্ল (সাদা) বর্ণের এবং অপরটি হল কৃষ্ণ বর্ণের ।

প্রশ্ন : ৭২৭ ॥ যোগমায়া এবং মহামায়ার কাজের মধ্যে মূল পার্থক্য কি?

উত্তর : যোগমায়া হলেন ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি । আর মহামায়া হলেন বহিরঙ্গা শক্তি । যোগমায়া জীবকে ভগবৎমুখী বৃত্তি প্রদান করে । আর মহামায়া বিক্ষেপ ও আবরণী শক্তি দ্বারা জীবকে মোহিত করে সংসারজালে আবদ্ধ করে রাখে । যোগমায়া অষ্টভুজ বিশিষ্ট । মহামায়া দশভুজ (দশ হাত) বিশিষ্ট ।

প্রশ্ন : ৭২৮ ॥ এই জড় জগতে প্রকৃত বন্ধু কে?

উত্তর : সংক্ষেপে উত্তর হল যিনি হরিভজনের সহায়ক হন, সৎ উপদেশের দ্বারা মায়ার জড়া-আসক্তি কাটাইয়া দিয়া ভগবৎমুখী করেন, তিনিই প্রকৃত বন্ধু । এর বিপরীত কাজ যারা করেন তারা আমাদের প্রকৃত বন্ধু নন । এমনকি পিতা মাতা, গুরু, দেবতা প্রমুখ কেউ আমাদের প্রকৃত বন্ধু নন যদি তাঁরা আমাদেরকে শ্রী হরির পাদপদ্মে ভক্তি করতে উৎসাহিত না করেন বা উপদেশ না দেন ।

প্রশ্ন : ৭২৯ ॥ প্রণাম কত ধরনের এবং কি কি?

উত্তর : প্রণাম বা নমস্কার বন্দনের অন্তর্গত একটি বিষয় । প্রণাম পাঁচ ধরনের ।

১. অভিবাদন ২. অষ্টাঙ্গ প্রণাম ৩. পঞ্চাঙ্গ প্রণাম ৪. করশির প্রণাম এবং ৫. সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ।

প্রশ্ন : ৭৩০ ॥ অষ্টাঙ্গ প্রণাম কি?

উত্তর : দুই বাহু, দুই পদ, জানুদ্বয়, বক্ষঃস্থল, মস্তক, দৃষ্টি, মন এবং বাক্য—এই আট ধরনের অবয়ব দ্বারা যে প্রণাম করা হয় তাকে অষ্টাঙ্গ প্রণাম বলে । দৃষ্টি দ্বারা প্রনাম বলতে চক্ষু সামান্য নিচু করে প্রণাম, মনের দ্বারা প্রণাম বলতে মনে মনে কপাল ভগবানের শ্রী চরণে স্থাপন পূর্বক প্রণাম এবং বাক্যের দ্বারা প্রণাম বলতে হে ভগবান! আপনি প্রসন্ন হউন, কৃপা করুন—এরূপ বাক্য বলতে বলতে প্রণাম বুঝায় ।

প্রশ্ন : ৭৩১ ॥ পঞ্চাঙ্গ প্রণাম বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : দুই জানু (হাটু), দুই হাত, মস্তক, বাক্য ও বুদ্ধি—এই পাঁচ ধরনের অবয়বের মাধ্যমে প্রণামকে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম বলে । পঞ্চাঙ্গ এবং অষ্টাঙ্গ প্রণাম সাধারণত ভগবৎ পুজার সময়ই প্রশস্ত ।

প্রশ্ন : ৭৩২ ॥ নমস্কার শব্দটির অর্থ কি?

উত্তর : নমঃ শব্দের ম-কারের অর্থ—অহঙ্কার । আবার ন কারের অর্থ মন্ত্রসিদ্ধি । কাজেই জীবের অপ্রাকৃত অনুভূতি লাভই প্রকৃত নমস্কার । নিজের কর্তৃত্ব অভিমান বা জড়-অহংকার ত্যাগের নামই নমস্কার বা প্রণতি ।

প্রশ্ন : ৭৩৩ ॥ প্রণাম বা নমস্কারের তাৎপর্য্য বা প্রয়োজন কি?

উত্তর : শ্রী গুরু-বৈষ্ণব ও ভগবানের শ্রী চরণে কায়মনোবাক্যে প্রণাম না করলে জীবের কখনো মঙ্গল হয় না। **শ্রী নরসিংহ পুরাণ** বলেন, "এই নমস্কার-রূপ যজ্ঞ সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত। একমাত্র সাষ্টাঙ্গ নমস্কারের দ্বারাই শ্রী হরিকে লাভ করতে পারা যায়।"

প্রশ্ন : ৭৩৪ ॥ শ্রী ভগবানকে প্রণামের মাহাত্ম্য বা সুফল কিরূপ?

উত্তর : স্থান-অস্থান বিচার না করেই ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করামাত্রই প্রণাম করা উচিত। জীব প্রণাম দ্বারাই পবিত্র হয়ে শ্রীহরিকে লাভ করতে পারেন। **স্কন্দ পুরাণ** বলেন, "যিনি ধরাতলে দণ্ডের ন্যায় নিপতিত হইয়া শ্রী ভগবানকে প্রণাম করেন, তাহাতে যত ধুলিকনা শরীরে সংলগ্ন হয় তিনি তত শত মন্বন্তরকাল স্বর্গে অবস্থান করেন। জানুযুগলের উপর ভর করে ভূমিতে মাথা অবনত বা স্পর্শ করে যে শ্রী ভগবানকে প্রণাম করে সে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পায়। ভগবান শ্রী নারায়নকে প্রণাম করলে যে পুণ্য হয়, সহস্রকোটি তীর্থে ভ্রমণ করলেও তার ১৬ ভাগের একভাগও পুণ্য হয় না। প্রণাম সময়ে দেহে যত ধূলিকণা লাগে প্রণামকারী ব্যক্তি তত সহস্র বছর বিষ্ণুলোকে অবস্থান করেন।" এভাবে **বিষ্ণু ধর্মোত্তর, শ্রী বিষ্ণু পুরাণ, শ্রী পদ্মপুরাণ, শ্রী বরাহ পুরাণ** ইত্যাদিতে ভগবানকে ভক্তিভরে প্রণামের মাহাত্ম্য অনেক বর্ণনা করা আছে।

প্রশ্ন : ৭৩৫ ॥ অনেককেই দেখি ভগবানের শ্রী বিগ্রহকে এক হাতে প্রণাম করছেন। এভাবে প্রণাম করা কি সঠিক?

উত্তর : সঠিক নয়, বরং অপরাধ হয়। **বিষ্ণু স্মৃতি**-তে উল্লেখ আছে, "মনুষ্য এক হস্তে ভগবানকে প্রণাম করলে তার জন্মাবধি সমস্ত ধর্ম নিস্ফল হয়।"

প্রশ্ন : ৭৩৬ ॥ কোন্ কোন্‌ভাবে ভগবানকে প্রণাম করতে নেই?

উত্তর : এই বিষয়ে অনেক বিধি নিষেধ আছে। নিচে কতিপয় বিধি নিষেধের কথা উল্লেখ করা হল।

১. এক হাতে প্রণাম নিষিদ্ধ।
২. দেহ বস্ত্র দ্বারা পুরাপুরি আবৃত বা আচ্ছাদন করে প্রণাম করতে নেই। **বরাহ পুরাণে** শ্রী ভগবান স্বয়ং বলেছেন, "যদি কোন মানব দেহকে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করে আমাকে প্রণাম করে তবে তার ধবলকুষ্ঠ এবং মুর্খত্ব প্রাপ্তি হয় (সে মুর্খ হয়)।"
৩. শ্রী কেশবের মন্দিরে শ্রী ভগবানের সম্মুখে, পশ্চাৎ দিকে, বাম দিকে, অতি নিকটে এবং গর্ভমন্দিরের মধ্যে জপ, হোম এবং নমস্কার নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন : ৭৩৭ ॥ শুদ্ধ বৈষ্ণব নন অথবা ভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভুক্ত ব্যক্তিকেও কি দেখলেই প্রণাম করতে হবে?

উত্তর : যথাবিহীত নিয়মে তিলক এবং গলায় তুলসী মালা-ধারণকারী ব্যক্তিকে দেখামাত্রই তাঁকে যথাবিহীত নিয়মে অভিবাদন করা উচিত। যদি সেই ব্যক্তি ভিন্ন বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ভুক্তও হন অথবা শুদ্ধ বৈষ্ণব না হন, তথাপি তার তিলক ও কণ্ঠের মালার প্রতি সম্মান দেখানোর লক্ষ্যে যথাবিহিত নিয়মে দণ্ডবৎ প্রণাম করা উচিত। শুদ্ধ বৈষ্ণব হলে তাঁকে ভূমিতে পতিত হয়ে দণ্ডবৎ প্রণাম করতে হবে। আর চিহ্নধারী বিদ্ধ-বৈষ্ণব হলে বৈষ্ণব চিহ্নের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য মাথা অবনত করে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

প্রশ্ন : ৭৩৮ ॥ আজকাল দেখি অনেকেই জপ মালা হাতে রেখেই ভগবানকে প্রনাম করেন। এটি কি সঠিক?

উত্তর : না। ভক্তিগ্রন্থ বা জপ মালা হাতে রেখে দণ্ডবৎ প্রণাম করা অপরাধ। আবার হাতে শ্রী ভগবৎ পুজার কোন উপকরণ ও ভগবানের প্রসাদপূর্ণ পাত্র নিয়ে বা উচ্ছিষ্ট লিপ্তগাত্রে দণ্ডবৎ প্রণাম করা নিষিদ্ধ। পাদুকা (সেণ্ডেল, জুতা ইত্যাদি) পরে শ্রী হরি-গুরু-বৈষ্ণবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করা অপরাধ। শিরস্ত্রাণ, শিরোভূষণ অথবা উত্তরীয় উন্মোচন (না খুলে) না করে দণ্ডবৎ প্রণাম করা অপরাধ। আবার ছাতা মাথায়, অথবা মাথায়, হাতে বা পিঠে কোন দ্রব্য নিয়ে দণ্ডবৎ প্রণাম করা অপরাধ।

(উৎস : নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলি, গৌড়িয় মিশন, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৫)।

প্রশ্ন : ৭৩৯ ॥ কোন বিশেষ বা নির্দিষ্ট আঙ্গুল দ্বারা কি তিলক ধারণ করা অত্যাবশক?

উত্তর : তিলক নির্মাণ বিষয়ে অঙ্গুলি সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—

১. অনামিকা বাঞ্ছিত ফল প্রদান করে।
২. মধ্যমা পরমায়ু বৃদ্ধি করে।
৩. কনিষ্ঠ পুষ্টি সাধন করে।
৪. তর্জনী মুক্তি প্রদান করতে পারে।

কাজেই যার যেরূপ বাঞ্ছা সে অনুযায়ী আঙ্গুল ব্যবহার করতে পারেন (উৎস : ঐ পৃষ্ঠা ১৮৭)।

প্রশ্ন : ৭৪০ ॥ তুলসী কি এক বিশেষ ধরনের গাছ মাত্র?

উত্তর : শ্রী তুলসী গাছের আকারে অর্চ্চা অবতার। তিনি বৃক্ষকুলে এসেছেন বলে সাধারণ গাছ নন। ইনি কৃষ্ণ প্রেষ্ঠ—পতিতপাবন-অবতার। তিঁনি কৃষ্ণকে দিতে পারেন। এঁর সেবা দ্বারা কৃষ্ণ ভক্তি লাভ হয়। যাঁকে দর্শন করলে সমস্ত পাপ নষ্ট হয়, যাঁকে জলদ্বারা সেচন করলে যমের ভয় দুর হয়, যাঁকে রোপন করলে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ হয়, যাঁকে ভগবানের শ্রীচরণে সমর্পণ করলে প্রেম ভক্তি লাভ হয়, সেই কৃষ্ণ প্রিয়া শ্রী তুলসী দেবী আমাদের সকলেরই প্রণম্য এবং নিত্য সেব্যা।

প্রশ্ন : ৭৪১ ॥ পঞ্জিকায় দেখি অধিমাস বা মলমাস। আসলে এটি কি?

উত্তর : স্মৃতি শাস্ত্রের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বছরকে ১২ ভাগে ভাগ করে প্রতি মাসের জন্য বিভিন্ন ধরনের সৎকর্ম নিরূপণ করেছেন। চান্দ্রমাস এবং সৌরমাসের মধ্যে মিল রাখবার জন্য ৩২ মাসে একটি করে মাস বাদ দিতে হয়। সেই মাসটির নাম অধিমাস। স্মৃতি শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ এই অধিমাসকে মলমাস বলেন। তারা একে মলিন মাস, মলি ম্লুচ ইত্যাদি নাম দিয়ে একে ঘৃনিত বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তাদের মতে এই মাসে কোন ধরনের শুভকর্ম করতে নেই।

প্রশ্ন : ৭৪২ ॥ মলমাসে নাকি কোন শুভকর্ম করতে নেই—একথা কতটুকু শাস্ত্রসম্মত?

উত্তর : স্মৃতি শাস্ত্র অনুযায়ী এই মাসে কোন শুভকর্ম করতে নেই। কিন্তু বৈষ্ণব শাস্ত্র অনুযায়ী এই মলমাস বা অধিমাস হল শ্রী পুরুষোত্তম মাস। তাই এই মাস পরমার্থ কাজের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ মাস বলে বৈষ্ণব মহাজনরা অভিমত প্রকাশ করেছেন। **বৃহৎনারদীয় পুরাণের** একত্রিশ অধ্যায়ে এই অধিমাসের মাহাত্ম্যের বর্ণনা রয়েছে। বার মাসের আধিপত্য এবং নিজের অপমান বিচার করে অধিমাস অনেক কষ্ট করে বৈকুণ্ঠে গমন করে নিজের দুঃখ শ্রী হরিকে জানান। বৈকুণ্ঠপতি কৃপা করে অধিমাসকে সঙ্গে নিয়ে গোলোকে শ্রী কৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হন। শ্রী কৃষ্ণ কৃপাপূর্বক বললেন যে, "আমি যে রূপ এই জগতে পুরুষোত্তম বলে বিখ্যাত—এই অধিমাসও সেরূপ পুরুষোত্তম বলে অভিহিত হবে। আমাতে যে সমস্ত গুণ আছে, সেই সমস্তই এই মাসে অর্পিত হলো। আমার সদৃশ হয়ে এই অধিমাস অন্য সকল মাসের অধিপতি হলো।" মলমাস বা অধিমাস তাই জগৎপুজ্য এবং সবার বন্দনীয়। অন্য সব মাস সকাম। আর এই মাসটি নিষ্কাম। এই মাসে শ্রী ভগবানকে যিনি ভক্তিসহকারে পূজা ও অর্চ্চন করেন তিনি ধন-পুত্র ইত্যাদি লাভ করে অবশেষে গোলোকবাসী হন।

প্রশ্ন : ৭৪৩ ॥ মন্দির বলতে কি দালান-কোঠা বিশিষ্ট কোন ঘর বুঝায়?

উত্তর : শ্রী মন্দির শুদ্ধ সত্ত্বময়। যেখানে শ্রী ভগবান থাকেন তাহাই শ্রী মন্দির। সেজন্য জীবহৃদয়কেও মন্দির বলা হয়। ভক্ত সাক্ষাৎ ভগবৎ—মন্দির। ভক্তহৃদয়েই শ্রী ভগবানের নিত্যবাস। এজন্য ভক্তই ভগবৎ গৃহ। শ্রী চৈতন্য ভাগবতে উক্ত হয়েছে—

বক্রেশ্বর পণ্ডিত—প্রভুর পূর্ণ শক্তি।
সেই কৃষ্ণ পায়, যে তাঁহারে করে ভক্তি।

বক্রেশ্বর হৃদয়ে কৃষ্ণের নিজ-ঘর।
কৃষ্ণ নৃত্য করেন, নাচিতে বক্রেশ্বর ॥
যে-তে স্থানে যদি বক্রেশ্বর—সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব তীর্থ শ্রী বৈকুণ্ঠময় ॥

উপরোক্ত কথা থেকে বুঝা যায় শ্রী ভগবান যে স্থানেই অবস্থান করুন না কেন তাই হল মন্দির।

প্রশ্ন : ৭৪৪ ॥ শ্রী বিষ্ণুর চরণামৃত পান করলে জীবের কি হয়?

উত্তর : শ্রী বিষ্ণুর চরণামৃত সর্বদা সমস্ত তীর্থ অপেক্ষা পবিত্র। জীব চরণামৃত পান করে পবিত্র হয়ে সর্বপ্রকার পাপ থেকে মুক্ত হয়। বিষ্ণুর চরণামৃত পান করলে কোটি ব্রহ্ম হত্যার পাপ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়। কিন্তু এই চরণামৃত মাটিতে পড়লে আটগুণ পাপ উৎপন্ন হয়। পদ্মপুরাণ বলেছেন—হে অম্বরীষ! হরির চরণামৃত যাঁর উদরে অবস্থিত থাকে তুমি তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে তাঁর চরণধূলি গ্রহণ কর।

যিনি প্রতিদিন শালগ্রাম-চরণামৃত পান করেন, তাঁকে আর জড়জগতে জন্ম নিতে হয় না। শ্রী চরণামৃত পান ও মাথায় ধারণ করলে সমস্ত দেবতাই সন্তুষ্ট হন। কলিকালে শ্রী হরির চরণামৃতই সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

প্রশ্ন : ৭৪৫ ॥ শিবের ধাম কোথায় এবং কিরূপ? সেখানে শিবের স্বরূপ কি?

উত্তর : চৌদ্দ ভূবনের অন্তর্গত দেবী ধামের উপরে শ্রী শিবধাম অবস্থিত। সেই ধাম মহাকাল ধাম নামে একাংশে অন্ধকারময়। সেই অংশভেদ করে মহাআলোকময় সদা-শিবলোক। এই শিবধামে শ্রী মহাদেব কর্পূরের ন্যায় গৌরবর্ণ, ত্রিনয়ন, দিগম্বর, কপালে দীপ্তিমান অর্ধচন্দ্র—অতি সুপুরুষ রূপে বিরাজমান। তাঁর হাতে ত্রিশূল, মাথায় জটা, গঙ্গাজলে অম্লান, গায়ে ভস্ম এবং তিঁনি বৈষ্ণব-চূড়ামনি বৃন্দের অস্থিদ্বারা (হাড়) নির্মিত মালা গলায় ধারণ করে আছেন। শ্রী গৌরী তাঁর কোলে বসে তাঁর সেবা করছেন।

প্রশ্ন : ৭৪৬ ॥ শিবের রূপ কত ধরনের এবং তাদের বৈশিষ্ট্যই বা কিরূপ?

উত্তর : শ্রী শিব বা শম্ভুর দুইটি রূপ আছে। বৈষ্ণব দর্শনে তিনি জগৎ গুরু **"বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভু"**—এই বিচার। এখানে তিনি মায়ার অতীত, অর্থাৎ মায়ার সঙ্গী নন। তাঁর অন্যরূপ হল মহাকাল রূদ্র বা সংহার মূর্তি। এই শিবেরই সঙ্গিনী হলেন মায়া বা মহাকালী। বৈষ্ণব দর্শনে শ্রীশিবকে বিষ্ণুর প্রিয়তম বা অভেদরূপে জানা যায়। এরূপ দর্শনে উমা ও মহেশ্বর বৈষ্ণবী ও বৈষ্ণব—উভয়ই হরি ভজনের সহায় এবং পরস্পরের মধ্যেও বৈষ্ণব বুদ্ধি।

প্রশ্ন : ৭৪৭ ॥ শিব নাকি দুই ধরনের। রুদ্র শিব এবং সদা শিব। এই সদা শিব সম্পর্কে কিছু জানতে চাই।

উত্তর : সদা শিব গুণ-অবতার রুদ্র শিব নন। তিনি ভগবান সংকর্ষণ থেকে সৃষ্ট। সদাশিব রাম নামের উপাসক। তাঁর গলায় তিনি শ্রী অনন্ত দেবকে সব সময় ধারণ করে থাকেন। তিনি মায়ার অধীন নন, বরং মায়াধীশ। তিঁনি গঙ্গাকে অর্থাৎ বিষ্ণুর পাদোদককে মাথায় ধারণ করে রেখেছেন। কণ্ঠে যে অনন্তদেব আছেন তিঁনিই সদাশিবের গুরুদেব।

শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ শ্রী কৃষ্ণের প্রিয়তম হওয়ায় সদাশিবকে উপাসনা করেন। তিনি দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম। শ্রী সদাশিব শ্রী বিষ্ণুর প্রিয়তম, তাঁর সেবা করলে শ্রী বিষ্ণু সুখী হন—এই বিচারে ভক্তগণ শ্রী সদাশিবের আরাধনা করে থাকেন।

প্রশ্ন : ৭৪৮ ॥ শিব যদি ভগবান হন, তবে কৃষ্ণের পুজা না করে শিব পুজা করলেইতো যথেষ্ট? কি বলেন?

উত্তর : ভগবান বলেছেন, আমার চেয়ে আমার ভক্তের সেবা ও পুজা বড়। এই অর্থে শ্রী কৃষ্ণ সেবা অপেক্ষা কৃষ্ণ ভক্ত শিবের পুজা বড় সন্দেহ নেই। কিন্তু কৃষ্ণ সেবায় উদাসীন বা কৃষ্ণ সেবা বিদ্বেষী হয়ে শ্রীশিবের পুজা করলে তা হবে পুজার নামে ছলনা ও পাষণ্ডতা। এরূপ পাষণ্ডতা ও কপটতা হৃদয়ে ধারণ করে যারা শিব পুজার ছলনা করে তারা মূলত শিব-বিদ্বেষী। শ্রী চৈতন্য ভাগবতে আছে—

অতএব সর্ব্বাদ্যে শ্রী কৃষ্ণে পুজি তবে।
প্রীতে শিবপুজি, পুজিবেক সর্ব্বদেবে।

যেখানে শিব পুজার ফলে কৃষ্ণ প্রীতিতে সিদ্ধি লাভ না হয় সেখানে সেইরূপ কল্পিত শিবের বৈষ্ণবত্ব নেই। সেরূপ কল্পিত শিবের পুজা বৈষ্ণব পুজা নয়, বরং অবৈষ্ণব পুজা, অবৈধ ও অশাস্ত্রীয় পুজা।

প্রশ্ন : ৭৪৯ ॥ সদাশিব এবং রুদ্র শিবের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : শিব বা শম্ভুর দুইটি রূপ আছে। সদাশিব এবং রুদ্র শিব। এই দুই রূপের মধ্যে পার্থক্য আছে।

১. সদাশিব ভগবান সঙ্কর্ষণ থেকে উদ্ভুত। রুদ্র শিব ব্রহ্মার ভ্রযুগল থেকে উৎপন্ন। শ্রী সদাশিব রুদ্র শিবের অংশী। অর্থাৎ সদাশিবের অংশই হলেন রুদ্রশিব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে—

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র—সদাশিবের অংশ।
গুণাবতার তেঁহো সর্ব্বদেব অবতংস ॥

২. সদাশিব গুণাতীত, মায়াধীশ। অর্থাৎ সত্ত্ব-রজ এবং তমঃগুণের অতীত এবং মায়ার অধীন নন। রুদ্র শিব হলেন তমঃগুণের আধার। তাঁর সঙ্গী হলেন মায়া বা মহাকালী। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে উক্ত হয়েছে—

নিজাংশ কলায় কৃষ্ণ তমোগুণ অঙ্গীকারে।
সংহারার্থে মায়া সঙ্গে রুদ্র রূপ ধরে।
মায়া সঙ্গ বিকারে রুদ্র, ভিন্নাভিন্ন রূপ।
জীবতত্ত্ব নহে, নহে কৃষ্ণের স্বরূপ।

[(চৈ.চ. মধ্য ২০/৩০৭-৩০৮)

৩. সদাশিব বৈকুণ্ঠের অন্তর্গত শিবলোকে শ্রী ভগবানের নিত্য সেবক রূপে বর্তমান। আর ব্রহ্মাণ্ডে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত কৈলাস ও কাশীধামে যিনি বিরাজ করেন তিনি রুদ্র শিব। তিনি তমোগুণের প্রধান দেবতা এবং তাঁর এই রূপ মহাপ্রলয়ের সময় তিরোহিত হয়।

প্রশ্ন : ৭৫০ ॥ শিবের একরূপ হল রুদ্র। এই রূপে শিব কত ধরনের এবং কি কি?

উত্তর : রুদ্র শিবের এগার ধরনের রূপ আছে। যথা—অজৈকপাত, অহিব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, দেবশ্রেষ্ঠ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র্য, জয়ন্ত, পিনাকী এবং অপরাজিত। এদের মধ্যে প্রায় রুদ্রই পঞ্চমুখ, ত্রিনয়ন, এবং দশ হাত বিশিষ্ট।

প্রশ্ন : ৭৫১ ॥ শ্রী অনন্ত দেবের কথা শাস্ত্রে দেখতে পাওয়া যায়। তিঁনি কোথায় অবস্থান করেন এবং তাঁর স্বরূপ কি?

উত্তর : কারনবারী সাগরের অতি গভীর জলের মধ্যে মহাকালপুর বলে একটি স্থান আছে। সেখানে সহস্র মাথাবিশিষ্ট মহাসর্পরূপে যে সংকর্ষণদেব বিরাজিত আছেন তিনিই অনন্তদেব নামে অভিহিত। তাঁর নয়ন দ্বি-সহস্র এবং গলা নীলবর্ণ বিশিষ্ট। **হরিবংশ** অনুযায়ী ভগবান শ্রী কৃষ্ণের হাতে যে সব অসুর নিহত হয়ে মুক্তি লাভ করে তারা এই মহাকালের জ্যোতির মধ্যে প্রবেশ করে।

প্রশ্ন : ৭৫২ ॥ শ্রীমদ্ ভাগবতের কয়টি প্রধান অধিবেশন হয়েছিল?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম অধিবেশন হয়—শ্রীল ব্যাসদেবের শম্যাপ্রাস আশ্রমে। সেখানে শ্রোতা ছিলেন শ্রীল শুকদেব এবং বক্তা ছিলেন তাঁর পিতা শ্রীল ব্যাসদেব। এর দ্বিতীয় অধিবেশন হয় ভারতের মজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত শুকরতলে। এখানে মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন শ্রোতা এবং বক্তা ছিলেন শ্রীল শুকদেব গোস্বামী।

তৃতীয় অধিবেশন হয় গোমতী নদীর তীরে নৈমিষারন্যে। এখানে ষাট হাজার মুনি-ঋষির মধ্যে শ্রীল সূত গোস্বামী শ্রীমদ্ ভাগবত কীর্তন করেছিলেন। এই কীর্তনের পরই শ্রীমদ্ ভাগবত লিপিবদ্ধ করা হয়।

প্রশ্ন : ৭৫৩ ॥ দেবী ভাগবত নামে নাকি একটি গ্রন্থ আছে। এর বিষয়বস্তু কি? বক্তা কে এবং শ্রোতাই বা কে?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভাগবতের সাথে পাল্লাদেয়ার লক্ষ্যে শ্রীমদ্ ভাগবতের অবৈধ অনুকরণে এই পুঁথি রচিত হয়েছে। শ্রীধর স্বামী

পাদের আবির্ভাবের কিছুকাল পূর্বে কোন অপস্বার্থপর মৎসর বিদ্বেষী অবৈষ্ণব দ্বারা রচিত দেবী ভাগবত নামক পুঁথিটিকে কেউ কেউ অষ্টাদশ পুরানের অন্তর্গত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ভগবৎ পরায়ণ কোন ব্যক্তিই একে পুরাণ বলে স্বীকার করেন নাই।

শ্রীমদ্ ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্দের আরম্ভ থেকে ১২শ স্কন্দের ৫ম অধ্যায় পর্য্যন্ত মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট শ্রীল শুকদেবের উক্তি। আর দেবী ভাগবতের ৪৫/৪৬ টি শ্লোকে মাত্র শ্রীল ব্যাসদেব শ্রী শুকের নিকট বলেছেন বলে উক্ত গ্রন্থে দেখা যায়। এর দ্বিতীয় স্কন্দ থেকে বাকী সমগ্র বইতে শ্রীল ব্যাসদেব পরীক্ষিৎ মহারাজের পুত্র শ্রী জনমেজয়ের কাছে বলেছিলেন বলে দেখা যায়। শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতকে বলেছিলেন। আর দেবী ভাগবত শ্রী ব্যাসদেব শ্রী জনমেজয়ের নিকট বলেছিলেন বলে সাজানো হয়েছে। প্রতি পদে পদেই দেবী-ভাগবতের অনুকরণ প্রবৃত্তি ধরা পড়ে। শ্রীমদ্ ভাগবত হলেন বেদের অকৃত্রিম ভাষ্য। আর দেবী ভাগবত হল ভাগবত—ধর্ম বিদ্বেষী আধুনিক গ্রন্থ। দেবী ভাগবতে ষষ্ঠী, মনসা ও মঙ্গলচণ্ডীর পূজার কথা আছে। ভাগবত ধর্মের কোথায়ও বা কোনও মহাপুরানে এরূপ উপাসনার কথা উল্লেখ নাই।

প্রশ্ন : ৭৫৪ ॥ শ্রীমতি রাধারানীকে গান্ধর্বা বলা হয় কেন?

উত্তর : শ্রী গান্ধর্বা বা শ্রী গান্ধর্বিকাই শ্রী বৃষভাণু রাজার নন্দিনী শ্রী রাধা। তিঁনি নৃত্য, গীত এবং বাদ্যে অত্যন্ত পটু বলে তাঁকে গান্ধর্বা বলা হয়।

প্রশ্ন : ৭৫৫ ॥ শ্রী কৃষ্ণের প্রাভব এবং বৈভব প্রকাশ বা বিলাস কি?

উত্তর : শ্রী দেবকী নন্দন কৃষ্ণ যখন চতুর্ভূজ মূর্ত্তি হন তখন তিনি প্রাভব বিলাস। শ্রী বলরাম শ্রী কৃষ্ণের বৈভব প্রকাশ। আবার কৃষ্ণরূপী দ্বিভুজ বাসুদেব বা দেবকীনন্দন হলেন কৃষ্ণের বৈভব প্রকাশ। প্রাভবে প্রভুত্ব এবং বৈভবে বিভূত্ব বর্তমান। রাসলীলায় শ্রী কৃষ্ণের যে বহুরূপে প্রকাশ, তাই প্রভাব প্রকাশ। দ্বারকায় ১৬১০০ রমণীর বিবাহে শ্রী

কৃষ্ণের যে বহুমূর্ত্তির কথা শুনা যায় তার নাম প্রাভব-বিলাস। শ্রী কৃষ্ণ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুন্ম, এবং অনিরুদ্ধ—এই আদি চতুর্ব্যুহ প্রকাশ করে দ্বারকা ও মথুরায় নানাভাবে এবং নানা রূপে বিলাস করেন। এই চারমূর্ত্তি কৃষ্ণের প্রাভব বিলাস।

প্রশ্ন : ৭৫৬ ॥ শাস্ত্রে দেখা যায় শ্রী কৃষ্ণের আদি চতুর্ব্যুহ হলেন বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুন্ম এবং অনিরুদ্ধ। এদের অবস্থান কোথায় কোথায়?

উত্তর : বৈকুণ্ঠের চারদিকে এঁরা ক্রমান্বয়ে অবস্থান করছেন। জলাবরণস্থ বৈকুণ্ঠে বেদবতীপুরে বাসুদেব, সত্যলোকের (ব্রহ্মলোকের) উপরিভাগে বিষ্ণুলোকে সঙ্কর্ষণ, দ্বারকাপুরে প্রদ্যুন্ম এবং ক্ষীর সমুদ্রের মধ্যবর্তী শ্বেত দ্বীপের ঐরাবতীপুরে অনন্ত শর্য্যায় অনিরুদ্ধ অবস্থান করছেন।

প্রশ্ন : ৭৫৭ ॥ কৃষ্ণে বর্হিম্মুখ কারা?

উত্তর : কর্মী, জ্ঞানী এবং বিষয়ী—এই তিন শ্রেণীর লোক কৃষ্ণে বর্হিম্মুখ—অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রতি যাদের প্রীতি নাই। কারন এসব লোক মিথ্যা স্বার্থসুখ নিয়ে ব্যস্ত। এই জড়দেহের ইন্দ্রিয় সকলের তৃপ্তি লাভের চেষ্টায়ই বিষয়ীর লক্ষ্য। পরকালে ইন্দ্রিয় তর্পনই কর্মীর কাম্য। আর নিজের সমস্ত কষ্ট দূর করবার জন্যই জ্ঞানীর প্রয়াস।

প্রশ্ন : ৭৫৮ ॥ জীব নিজের সুকৃতি ফলেই ভক্তি লাভ করে। তাহলে ধর্ম প্রচারের আর প্রয়োজন আছে কি?

উত্তর : একথা সত্য। তবে ভক্তি সুদৃঢ় করার জন্য ধর্মপ্রচারের আবশ্যকতা আছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু ঠাকুর হরিদাসকে লক্ষ্য করে বলেছেন—

নিজ নিজ ভাগ্য বলে জীব পায় ভক্তি।
ভক্তি লভিবারে সকলের নাহি শক্তি ॥
সুকৃতজনের ভক্তি দৃঢ় করিবারে।
আইলাঙ যুগধর্ন্ম নামের প্রচারে ॥

মহাপ্রভুর উক্তি থেকেই স্পষ্ট বুঝা যায় জীব নিজের ভাগ্যের কারণে ভক্তি লাভ করতে পারলেও অনেক সময় নানা কারণে ঐ ভক্তি সংরক্ষণ করতে পারে না। কাজেই সুকৃতিবান জীবের ভক্তি শক্তিশালী করবার জন্য ভগবানের প্রেম, ভক্তি, ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি প্রচারের আবশ্যক আছে।

প্রশ্ন : ৭৫৯ ॥ পঞ্চতত্ত্ব কি একই বস্তু?

উত্তর : হ্যা। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে—

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তঃরূপ স্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যঃ নমামি ভক্তি শক্তিকম্ ॥

অর্থাৎ কৃষ্ণের ভক্ত রূপ, ভক্ত স্বরূপ, ভক্ত অবতার, ভক্ত এবং ভক্তি শক্তি—এই পঞ্চতত্ত্বের আকারে আবিভূর্ত শ্রী কৃষ্ণকে আমি প্রণাম করি।

আবার বলা হয়েছে—

পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ চৈতন্যের সঙ্গে।
পঞ্চতত্ত্ব লঞা করেন সঙ্কীর্তন রঙ্গে ॥
পঞ্চতত্ত্ব—এক বস্তু নাহি কিছু ভেদ।
রস আস্বাদিতে তত্ত্ব বিবিধ বিভেদ ॥

অর্থাৎ শ্রী গৌর সুন্দর, শ্রী নিত্যানন্দ, শ্রী অদ্বৈত, শ্রী গদাধর ও শ্রী শ্রী বাস—আদি পঞ্চতত্ত্বে কোন ভেদ নাই। কেবল রস-আস্বাদনের জন্য বিচিত্র লীলাময় কৃষ্ণই ভক্ত রূপ, ভক্ত স্বরূপ, ভক্ত অবতার, ভক্ত শক্তি এবং শুদ্ধ ভক্ত—এই পাঁচ রূপে অবতীর্ন হয়েছেন।

প্রশ্ন : ৭৬০ ॥ পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে বিষ্ণুতত্ত্ব কিরূপ?

উত্তর : পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে স্বয়ংরূপ ভক্তরূপ, স্বয়ং প্রকাশ ভক্তস্বরূপ এবং অংশ রূপ ভক্তাবতারই বিষ্ণুতত্ত্ব। অর্থাৎ শ্রীমন্ মহাপ্রভু, শ্রী নিত্যানন্দ এবং শ্রী অদ্বৈত প্রভু—এই তিন হলেন বিষ্ণুতত্ত্ব।

প্রশ্ন : ৭৬১ ॥ শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুই কি দ্বাপর যুগের বলরাম এবং ত্রেতাযুগের লক্ষ্মণ? এ সম্পর্কে কি শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে?

উত্তর : শ্রী চৈতন্য ভাগবতে বলা হয়েছে—

সর্বাবতারী কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ—শ্রী বলরাম ॥

শ্রী বলরাম গোসাঞি মূল সঙ্কর্ষণ।
পঞ্চরূপ ধরি করে কৃষ্ণের সেবন।
সর্বরূপে আস্বাদয়ে কৃষ্ণ সেবানন্দ।
সেই বলরাম গৌর সঙ্গে নিত্যানন্দ ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপ পূর্বে হঞা লক্ষণ।
লঘুভ্রাতা হঞা করে রামের সেবন।

শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু কৃষ্ণ-অবতারে শ্রী কৃষ্ণের বড় ভাই শ্রী বলরাম রূপে কৃষ্ণের সেবা এবং আনন্দ বাড়ান। আবার শ্রী রাম অবতারে শ্রী রামচন্দ্রের ছোট ভাই লক্ষণরূপে তাঁর সেবায় নিয়োজিত হন। আর কলিযুগে শ্রী গৌর অবতারে—

সেই কৃষ্ণ—শ্রী চৈতন্য, নিত্যানন্দ—রাম
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম ॥

প্রশ্ন : ৭৬২ ॥ শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর নাকি সেবা করেন? কিভাবে?

উত্তর : শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু হলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বিতীয় দেহ। তিনি নিজে ঈশ্বরের প্রকাশ হয়েও সেবা-অভিমানকারী—অর্থাৎ সেবকরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। শ্রী চৈতন্য ভাগবত অনুযায়ী তিনি দশরকমভাবে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সেবা করেন।

সখা, ভাই, ব্যজন, শয়ন, আবাহন।
গৃহ, ছত্র, বস্ত্র, যত ভূষণ, আসন ॥

প্রশ্ন : ৭৬৩ ॥ শ্রী অদ্বৈত প্রভুতো বিষ্ণু তত্ত্ব। তাহলে তিনি আবার ভক্ত—অবতার হন কিভাবে?

উত্তর : শ্রীল অদ্বৈত প্রভু ঈশ্বর তত্ত্ব। তবে ভগবানের অবতার মহাবিষ্ণু হয়েও শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলার সহায়তার জন্য ভক্তরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই জন্য তাকে ভক্ত-অবতার বলা হয়। শ্রী চৈতন্য ভাগবতে বলা হয়েছে—

মহাবিষ্ণু সৃষ্টি করেন জগদাদি কার্য্য।
তা'র অবতার সাক্ষাৎ অদ্বৈত আচার্য্য ॥

মহাবিষ্ণুর অংশ অদ্বৈত গুণধাম।
ঈশ্বরে অভেদ, তেঞি অদ্বৈত পূর্ণ নাম ॥
চৈতন্য গোসাঞিকে আচার্য্য প্রভুজ্ঞান।
আপনে করেন তাঁর দাস অভিমান ॥
সেই অভিমান সুখে আপনা পাসরে।
কৃষ্ণ দাস হও, জীবে উপদেশ করে ॥

প্রশ্ন : ৭৬৪ ॥ শ্রী নিত্যানন্দ এবং শ্রী অদ্বৈত প্রভুর সেবকগনের মধ্যে কি মধুর-আশ্রিত ভক্ত লক্ষ্য করা যায়?

উত্তর : না। নিত্য মধুর আশ্রিত ভক্তগণ শ্রী গৌর সুন্দরের সেবক বৃন্দ। যেমন স্বরূপ দামোদর, রায়রামানন্দ প্রমুখ। শ্রীল নিত্যানন্দ এবং শ্রী অদ্বৈত প্রভুর সেবকগণ সাধারণত বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য ও শান্তরসের আশ্রিত। তারা শুদ্ধ ভক্ত তত্ত্ব।

প্রশ্ন : ৭৬৫ ॥ পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে কি গুরু তত্ত্ব আছেন?

উত্তর : হ্যা। পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য, প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রী অদ্বৈত, গদাধর, শ্রী বাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ—এই পদে যে আদি-শব্দ আছে, তার মধ্যে গুরুতত্ত্ব আছেন। গুরুতত্ত্বে দীক্ষা গুরু, শিক্ষাগুরু এবং চৈত্য গুরু—এই তিন ধরনের গুরু বুঝতে হবে। শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর বলেছেন আদি শব্দে যে গুরুদেব, ঐশ্বর্য্যরসে তিনিই শ্রীবাস পণ্ডিতের সাথে অভিন্ন। আবার মধুর রসে তিনিই শ্রীগদাধরের সাথে অভিন্ন।

প্রশ্ন : ৭৬৬ ॥ নববিধা ভক্তির একটি অন্যতম অঙ্গ হল পাদসেবন। এই পাদসেবন বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : সাধারণ অর্থে পাদসেবন অর্থে পরিচর্য্যা বুঝায়। বিস্তৃত অর্থে পাদসেবন বলতে শ্রীমূর্ত্তির দর্শন, তাঁর স্পর্শ, শ্রী মন্দির পরিক্রমা, শ্রীনবদ্বীপ-শ্রী বৃন্দাবন পরিক্রমা, ভগবৎ মন্দির, গঙ্গা, যমুনা, পুরুষোত্তম ধাম, দ্বারকা, মথুরা ইত্যাদি তীর্থে গমন ও শ্রী গঙ্গা-যমুনায় স্নান করা বুঝায়। আবার শ্রী তুলসী সেবাও পাদসেবন ভক্তির অন্তর্গত।

[উৎস : নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলি ২য় খণ্ড, গৌড়ীয় মিশন পৃষ্ঠা ২৫৪।]

প্রশ্ন : ৭৬৭ ॥ নিত্য কর্ম ও নৈমিত্তিক কর্ম কি?

উত্তর : শরীর, মন, সমাজ এবং পরলোকের জন্য মঙ্গলজনক কর্মকে নিত্যকর্ম বলে। নিত্যকর্ম সকলের কর্তব্যকর্ম। আবার যে সব কর্ম কোন নিমিত্ত বা কারণকে আশ্রয় করে যখন নিত্য কর্মের ন্যায় করা হয় তখন তাকে নৈমিত্তিক কর্ম বলে। সন্ধ্যাবন্দনা, পবিত্র উপায়ে শরীর ও সমাজ সংরক্ষণ, সত্য ব্যবহার, যথাযোগ্য নিয়মে সংসার পালন—এই সকল হল নিত্যকর্ম। মৃত-পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য পালন, পাপ করলে প্রায়শ্চিত্ত—এসবই নৈমিত্তিক কর্ম।

প্রশ্ন : ৭৬৮ ॥ যোগমার্গ কত ধরনের এবং কি কি?

উত্তর : যোগমার্গ সাধারণতঃ দুই প্রকার—রাজ যোগ এবং হঠ যোগ। দার্শনিক এবং পুরান পণ্ডিতেরা যে যোগ অভ্যাস করেন তার নাম রাজ যোগ। তান্ত্রিক পণ্ডিতরা যে যোগের ব্যবস্থা করেছেন তার নাম হঠ যোগ। সমাধি হল রাজ যোগের মূল অঙ্গ। সমাধির অর্থ হল সিদ্ধি বা কোন কিছুর পূর্ণতা লাভ। এই সমাধি স্তরে পৌছার জন্য যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান ও ধারণা—এই কয়েকটি অঙ্গের সাধন করতে হয়। এদেরকেই যোগের অষ্ট-অঙ্গ বলা হয়। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরি গ্রহ—এদের নাম হল যম। শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায়, ও ঈশ্বর প্রণিধান—এই কয়টির নাম নিয়ম। স্বস্তিক ও পদ্ম ইত্যাদি শরীর সংস্থান বিশেষের নাম প্রণায়াম। বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়সমূহকে বিয়োজনের নাম প্রত্যাহার। নাভিচক্র ও নাকের অগ্রভাগ ইত্যাদি স্থানে চিত্তের স্থির করার নাম ধারণা। কোন বস্তু বা বিষয়ে চিত্তের একাগ্রতার নাম ধ্যান। সমস্ত বিষয়ে বিরাগ অবস্থায় স্ফুতি বিশিষ্ট চিত্তে অবস্থান করার নাম সমাধি। সমাধিই মুক্তি।

প্রশ্ন : ৭৬৯ ॥ কর্মের মাধ্যমেওতো ভগবানের কৃপা লাভ করা যায়—একথাতো গীতাতেই রয়েছে। তাহলে কর্মই ধর্ম—এই নীতিমালা মেনে চললে অসুবিধা কোথায়?

উত্তর : কর্মযোগে ভগবানের আরাধনার লক্ষণ না থাকলে তা অধঃপতনের কারণ হয়। হরিকথায় রুচিই সর্বতোভাবে মূল প্রয়োজন।

এর উপলক্ষণ রূপেই অন্যান্য সাধন করা যায়। এই জন্যই শ্রী ভগবান বলেন—

তাবৎ কর্মানি কুর্ব্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবত।
মৎ কথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥

(শ্রীমদ্ ভাগবত ১১/২০/১)

অর্থাৎ যে কাল পর্য্যন্ত কর্ম বিষয়ে দুঃখজ্ঞান বা আমার কথা শ্রবণে শ্রদ্ধার উদয় না হয় সেই কাল পর্য্যন্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মসমূহের আচরণ করবে।

প্রশ্ন : ৭৭০ ॥ বৈষ্ণবের স্ত্রী সঙ্গী না হওয়ার জন্য শাস্ত্রে নিষেধ রয়েছে। এই স্ত্রী সঙ্গী বলতে আসলে কি বুঝায়?

উত্তর : শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীমন মহাপ্রভু বলেছেন—

অসৎ সঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রী সঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর।

স্ত্রী সঙ্গী দুই প্রকার—বৈধ এবং অবৈধ। বৈধ কর্মীও যদি হরি ভজন না করে, তবে পূণ্যকর্ম করেও সে স্ত্রী সঙ্গী। গৃহস্থ বৈধভাবে স্ত্রী সঙ্গ করলেও যদি হরি ভজন না করে শ্রীমদ্ ভাগবতম এর বিচারে তাও অবৈধ। পরের স্ত্রীর সাথে উঠাবসা, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলা, মনে মনে বৈধ স্ত্রী ব্যতীত অন্য মহিলাকে কামনা করা—এসবই অবৈধ স্ত্রী সঙ্গ। এমনকি শাস্ত্রবিহীত অনুসারে নিজের স্ত্রীর সাথে সঙ্গদানের বাইরে স্ত্রীর প্রতি অতিরিক্ত মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তিকেও স্ত্রী সঙ্গী বলা যায়। শ্রীমন মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে শাসন করতে গিয়ে বলেছেন—

প্রভু কহে, বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পাঁরো আমি তাহার বদন।
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় ক'রে বিষয় গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ॥

প্রশ্ন : ৭৭১ ॥ স্ত্রী-সঙ্গীদের পরিণাম কি?

উত্তর : ভগবান শ্রী কপিলদেব বলেন, "হে মাতঃ। আমার স্ত্রী রূপা মায়ার প্রভাব দেখ—সে একটি মাত্র ভ্রভঙ্গে দিগ্বিজয়ী বীরদেরকে

পর্যুদস্ত ও পদাবনত করে থাকে। যিনি সাধন ভক্তিযোগের পরপার (কৃষ্ণ সাধ্যপ্রেমা) লাভ করতে ইচ্ছুক, তিনি কখনো কামিনীর সঙ্গ করবেন না। স্ত্রী রূপা দৈবী মায়া সেবার ছলে ধীরে ধীরে পুরুষের কাছে গমন করে। কিন্তু বুদ্ধিমান সাধক তাকে তৃণ দ্বারা আচ্ছাদিত কুয়ার মতো মনে করবেন।"

শ্রী নারদ মুনি রাজা প্রাচীনবর্হিকে বলেন, "স্ত্রী সঙ্গী মূঢ়। ফুলের ন্যায় প্রথমে সরস এবং পরিণামে বিষয় ধর্মযুক্ত স্ত্রীগণের আশ্রয় স্থল গৃহে থেকে যে ব্যক্তি জিহ্বা ও উপস্থের সাহায্যে কাম সুখ খোজার জন্য স্ত্রীগণের সাথে সহবাস করে, তাদের প্রতি নিজের মন নিবিষ্ট করে ফেলেছে সেই হরিভজনে বিমুখ স্ত্রী-সঙ্গী নিরয়গামী হবে সন্দেহ নাই।" শ্রী যমরাজ বলছেন, ভগবানের সেবায় বিমুখ হয়ে যে সকল অসাধু ব্যক্তি নরকের দ্বার স্বরূপ স্ত্রী সঙ্গে একান্তই লোলুপ, হে দূতগণ তোমরা তাদেরকে আমার কাছে নিয়ে আসবে।

প্রশ্ন : ৭৭২ ॥ স্ত্রী সঙ্গের কথা শাস্ত্রে বর্জন করতে বলা হয়েছে। তাহলে কি নিজের বোন, স্ত্রী এবং মার সাথেও সঙ্গ করা যাবে না?

উত্তর : শ্রী নারদ মুনি ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন—স্ত্রীলোক ও স্ত্রীসঙ্গী ভক্তির সাথে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু মাত্রই ব্যবহার কর্তব্য। কারণ প্রবল ইন্দ্রিয় সকল বিষয়-বৈরাগ্য সন্ন্যাসীর মনও হরণ করতে পারে। নারী সাক্ষাৎ অগ্নি এবং পুরুষ হল ঘৃত এবং তৈল।

এজন্য নির্জনে নিজের কন্যার সাথেও একত্রে অবস্থান করা উচিত নয়। নিজের স্ত্রীর প্রতি ভোগ্য বুদ্ধি পরিত্যাগ করেই তার সাথে সঙ্গ করা উচিত। শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেন—

কনক-কামিনী দিবস-যামিনী।
ভাবিয়া কি কাজ অনিত্য সে সব।
তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব ॥
কামিনীর কাম নহে তব ধাম।
তাহার মালিক কেবল যাদব ॥
... ...

কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা বাঘিনী
ছাড়িয়াছে যারে সেইত বৈষ্ণব।

কাজেই ভোগ্য বুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করতে পারলে প্রয়োজন অনুসারে মাতা, বোন এবং অপর কোন স্ত্রীর সাথে আলাপ করা যেতে পারে।

প্রশ্ন : ৭৭৩ ॥ দীক্ষা শব্দটির প্রকৃত অর্থ কি?

উত্তর : দীক্ষা শব্দটির প্রকৃত অর্থ হল দিব্যজ্ঞান। অর্থাৎ যা থেকে দিব্য জ্ঞানের উদয় হয় এবং পাপ সম্পূর্ণ ক্ষয় হয় তাই হল দীক্ষা। দিব্ ধাতুর অর্থ প্রকাশ বা আলো। যখন স্বপ্রকাশ জ্ঞান লাভ হয়—তখন রসের উদয় হয়। তখনই দীক্ষার পূর্ণ প্রাপ্তি হয়।

দীক্ষা শব্দটি শাস্ত্রে কয়েক মিনিট মন্ত্রগ্রহণ বা মন্ত্র প্রদান কাল ব্যাপীরূপে কোথায়ও ব্যবহার হয় নাই। দীক্ষা দীক্ষিত ব্যক্তির সিদ্ধি পর্য্যন্ত নিয়মপূর্বক ভজন কাল বুঝায়। রসের উদয় হওয়া পর্য্যন্ত দীক্ষা। রস উদয়ের জন্য ভজনের যে নিয়ম বা whole course of regulation and regularity তাই হল দীক্ষা। এভাবে একসময় ব্রজবাসী বা গৌড়ীয়ের দাস হওয়া যায়। তখন ব্রজে বাস (মানসিকভাবে হলেও) এবং গৌরলীলা বা সংকীর্তন রাসে অধিকার হয়। এরূপ অধিকার লাভের প্রণালীর নামই দীক্ষা। (সূত্র : নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলী ২য় খণ্ড গৌড়ীয় মিশন পৃষ্ঠা ২৬৩-২৬৫)।

প্রশ্ন : ৭৭৪ ॥ গায়ত্রী মন্ত্রের মাহাত্ম্য কি?

উত্তর : গায়ত্বং ত্রায়তে যস্মাদ্ গায়ত্রী ত্বং ততঃ স্মৃতাঃ—অর্থাৎ যে বস্তু গানকারীকে ত্রান করে বা গান দ্বারা ত্রান বা উদ্ধার করায় তা হল গায়ত্রী। গায়ত্রী—শক্তি নামাত্মক মন্ত্র—শক্তিমান।

প্রশ্ন : ৭৭৫ ॥ কৃষ্ণ মন্ত্রের তাৎপর্য্য কি?

উত্তর : কৃষ্ণ মন্ত্র থেকে সংসার মোচন হয়। কৃষ্ণ নাম হতে কৃষ্ণের চরণপ্রাপ্তি হয়। স্বয়ং ভগবান শ্রী গৌরহরি বলেছেন—

কৃষ্ণ মন্ত্র হৈতে হ'বে সংসার মোচন।
কৃষ্ণ নাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥

নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্বমন্ত্রসার নাম—এই শাস্ত্র মর্ম ॥

প্রশ্ন : ৭৭৬ ॥ কৃষ্ণ মন্ত্রে পুরশ্চরণের কথা শুনা যায়। ইহা কি?

উত্তর : সকালে, মধ্যাহ্নে এবং সায়াহ্নে—এই তিন সময়ে নিত্য পুজা, জপ, তর্পণ, হোম ও ব্রাহ্মণ ভোজন—এই পঞ্চ অঙ্গকে পুরশ্চরণ বলে। গুরুর থেকে পাওয়া মন্ত্রের সিদ্ধির জন্যই এই ব্যবস্থা। শতবর্ষ জপ করলেও পুরশ্চরণ ছাড়া মন্ত্রসিদ্ধি হয় না।

প্রশ্ন : ৭৭৭ ॥ গুরুর থেকে কানে কানে মন্ত্র লাভ করলেই নাকি দীক্ষা লাভ হয়ে যায়। একথা কি সত্যি?

উত্তর : যেনতেন এবং অসাধু গুরুর কাছ থেকে যে ভাবেই মন্ত্র নেয়া হউক না কেন সেই মন্ত্র শিষ্যকে দিব্য জ্ঞান লাভ করাইতে সমর্থ হন না। এমনকি সদ্ গুরুর কাছ থেকেও দীক্ষা লাভ করে দিব্য জ্ঞানের অভাব ও পাপক্ষয় না হলে দীক্ষা হয় নাই বলে জানতে হবে। কারণ মন্ত্রের যথাবিহীত অর্থ না জেনে জপ করলে জপের সিদ্ধি হয় না। মন্ত্রের অর্থ না জানলে জীবের দিব্য জ্ঞান হয় না এবং পাপ থেকেও নিবৃত্তি হয় না।

প্রশ্ন : ৭৭৮ ॥ দীক্ষা মন্ত্র এবং কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্র এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টি বেশি কার্যকরী?

উত্তর : শ্রী কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্র। এই নাম অসীম শক্তিসম্পন্ন। আবার দীক্ষামন্ত্রও নামাত্মক। দীক্ষা মন্ত্রে নমঃ অথবা স্বাহা শব্দের সংযোগ আছে। তাই মন্ত্রপ্রভাবে জীব সংসার মুক্ত—অর্থাৎ কৃষ্ণ চরণে শরনাগতির ফলে অনর্থ মুক্ত হন। তখন অনর্থমুক্ত জীবের জিহ্বায় শুদ্ধ নাম স্বয়ং নিত্য করতে থাকে। ভক্ত তখন শ্রী নাম প্রভুর কৃপায় নামী শ্রী কৃষ্ণের কাছ থেকে প্রেম লাভ করেন।

শ্রী নাম সেবার (নিরাপরাধে মহামন্ত্র জপে) দ্বারাই সব ধরনের সিদ্ধি লাভ হয়। এতে দীক্ষা ও পুরশ্চরণেরও অপেক্ষা নাই। তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে মন্ত্র দীক্ষার আবশ্যকতা কি? একথা সত্য যে শ্রী

ভাগবত মতে অর্চ্চন ছাড়াও শরনাগতি, সাধু সঙ্গ ও সেবা, শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ ইত্যাদির যে কোন একটি দ্বারাই পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। এক্ষেত্রে পঞ্চরাত্রিক অর্চ্চন মার্গের আবশ্যকতা নাই। তবুও শ্রী নারদসহ অপরাপর মহাজনদের মতে যারা ভগবানের সাথে বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপনে ইচ্ছুক তারা দীক্ষা লাভের পর অবশ্যই অর্চ্চন করবেন। জীবের প্রায়ই স্বাভাবিক ভোগপর দেহাদি সম্বন্ধ থাকায় তার স্বভাব কদর্য্য এবং চিত্ত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে। এইসব কমানো বা নিঃশেষের জন্য শ্রীল নারদসহ অন্যান্য মুনিগণ অর্চ্চন মার্গে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দীক্ষামন্ত্রের কিছু বিশেষ মর্যাদা স্থাপন করেছেন। দীক্ষামন্ত্রে ভগবানের নামের সাথে নমঃ শব্দ সংযোগ থাকায় নামের অনুগতভাবযুক্ত বলা যায়। এজন্য আত্মাকে বিশুদ্ধ করবার জন্য সাধারণ লোকের জন্য দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ অতি আবশ্যকীয়।

প্রশ্ন : ৭৭৯ ॥ গুরু কত ধরনের এবং তাঁদের করণীয় কি কি?

উত্তর : গুরু তিন প্রকারের হন : দীক্ষা গুরু, শ্রবণ গুরু এবং শিক্ষা গুরু। মন্ত্র দীক্ষাগুরু একজন হন—একাধিক হতে পারেন না। শ্রবণ গুরু এবং শিক্ষা গুরু অনেক হতে পারেন। মন্ত্র গুরু শ্রী ভগবানের সাথে শিষ্যের সম্বন্ধ স্থাপন করে দেন। শ্রবণ গুরুর সঙ্গ থেকে শাস্ত্রীয় জ্ঞান লাভ হয়। দীক্ষা গুরু দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন। শিক্ষাগুরু অভিধেয়—অর্থাৎ ভজন শিক্ষা দেন। অনেক সময় দীক্ষা গুরুও শিক্ষাগুরুর কার্য্য করে থাকেন। একজনের শিক্ষাগুরু অন্যজনের দীক্ষা গুরুও হতে পারেন।

দীক্ষা গুরু এবং শিক্ষা গুরু উভয়েই সেবকরূপী ভগবান। উভয়ই কৃষ্ণ তত্ত্বাবিদ এবং আশ্রয় বিগ্রহ। শ্রবণ গুরু বা বত্মাদেশ গুরু যে কেউ হতে পারেন না। শ্রবণ গুরু দুই প্রকারের : সরাগ এবং নীরাগ। সরাগ বক্তা লোলুপ এবং কামী। তাঁর উক্তি হৃদয় স্পর্শ করে না—অর্থাৎ হৃদয়ে দৈন্যতার সৃষ্টি করায় না। তিনি কেবল উপদেশই প্রদান করেন। কিন্তু নিজের জীবনে কখনো এই উপদেশ-দেওয়া বিষয়ের পরীক্ষা বা প্রয়োগ

করেন না। এজন্য তার উপদেশ অনিষ্টকর। আর যাঁর কথায় জীবের কাম-ক্রোধ ইত্যাদি দূর হয়ে যায়, হৃদয়ে অনুতাপ, অনুশোচনা, ও দৈন্য সৃষ্টি করে, তিনিই নীরাগ বক্তা বা প্রকৃত শ্রবণ গুরু। শ্রবণ গুরু সর্বজীবে ভগবৎ দর্শন করেন। তিনি চিন্ময়-অনুভব বিশিষ্ট। সরাগ বক্তার নিজের বিশ্বাস, শরনাগতি বা আনুগত্য কম। এই জন্য নীরাগ শ্রবণ গুরুর সঙ্গ দ্বারাই জীবের মঙ্গল হয়। এরূপ শ্রবণ গুরুও আবার শিক্ষা গুরু এবং দীক্ষা গুরু হতে পারেন।

প্রশ্ন : ৭৮০ ॥ ব্রহ্মার গুরুদেব কে এবং তিনি কিভাবে দীক্ষা লাভ করেন?

উত্তর : ব্রহ্মার গুরুদেব হলেন স্বয়ং শ্রী কৃষ্ণ। **ব্রহ্ম সংহিতা** অনুযায়ী ভগবান শ্রী কৃষ্ণের বংশী ধ্বনীর এয়ীমূর্ত্তিময়ী গতি বেদমাতা সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজন—এই তিন রূপে প্রকাশিত হয়ে ব্রহ্মার মুখে প্রবিষ্ট হন। এভাবে ব্রহ্মা কৃষ্ণের বেনু বা বাঁশী থেকে নিঃসৃত গায়ত্রী দীক্ষা লাভ করে আদি গুরু শ্রী কৃষ্ণ কর্তৃক দ্বিজ সংস্কার প্রাপ্ত হন।

প্রশ্ন : ৭৮১ ॥ দীক্ষা লাভ করলে কি জীবের দ্বিজত্ব লাভ হয়?

উত্তর : শ্রীল সনাতন গোস্বামী বৈষ্ণব দীক্ষার প্রভাবে মানুষ মাত্রেই বর্ণ পরিবর্তনের কথা **তত্ত্ব সাগর** গ্রন্থ থেকে শ্রী হরিভক্তিবিলাসে বর্ণনা করেছেন : যেরূপ কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা তামা স্বর্ণ হয়ে যায় সেইরূপ বৈষ্ণব দীক্ষা বিধানের দ্বারা মনুষ্য মাত্রেরই বিপ্রতা লাভ হয়। শ্রীল জীব গোস্বামী ব্রহ্ম সংহিতাসহ অনেক শাস্ত্র এবং মহাজনের বাক্য উদ্ধার করে বলেছেন যে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা লাভ করে মানুষ উপ-নয়ন সংস্কার লাভ করতে পারে।

প্রশ্ন : ৭৮২ ॥ দীক্ষা লাভের পরও যদি কারো ভোগবুদ্ধি থাকে তবে কি এরূপ ব্যক্তি দীক্ষার ফললাভ করতে পারবে?

উত্তর : দীক্ষার পরও যদি ভোগবুদ্ধি থাকে তবে স্বরূপের দেহ প্রকাশিত হয় নাই জানতে হবে। স্বরূপের দেহ বা অপ্রাকৃত দেহই

আত্মা। ভজন করতে করতে নিজের সুখ লাভের অনুভূতি বা ইচ্ছা কমতে থাকে এবং কৃষ্ণের অনুসন্ধানে রুচি হয়। ইহাই দীক্ষার ফল। তা না হলে দীক্ষা হয় নাই বুঝতে হবে। কারণ ভগবানের প্রতি প্রীতি ও সেবার ইচ্ছা যদি হৃদয়ে প্রকাশিত না হয় তাহলে দীক্ষা হয়েছে কি করে বলা যাবে?

প্রশ্ন : ৭৮৩ ॥ দীক্ষার পূর্ণতা লাভ কখন হয়?

উত্তর : সদ্ গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা লাভে ভগবানের সাথে সম্বন্ধ সৃষ্টি হয়। এরপর শ্রী গুরুদেবের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে যখন অভিধেয় যাজন করতে করতে সম্বন্ধ জ্ঞানে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হন এবং প্রয়োজনরূপ কৃষ্ণপ্রেম লাভে ধন্য ও কৃতার্থ হন, তখনই তাঁর দীক্ষার পরিপূর্ণতা অর্জন হয়। কাজেই দীক্ষার বাহ্য অনুষ্ঠান সমাপ্ত হলেই দীক্ষা শেষ হয়েছে—একথা মনে করার কোন হেতু নেই।

প্রশ্ন : ৭৮৪ ॥ বৈষ্ণবের পঞ্চ সংস্কার কি?

উত্তর : তাপ (অনুতাপ), তিলক, নাম, মন্ত্র জপ এবং যজ্ঞ—এই হল বৈষ্ণবের পঞ্চ সংস্কার। সংসারে বিরক্ত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানে অনুরক্ত হওয়ার নামই তাপ। হরি মন্দির—অর্থাৎ হরির পাদপদ্মে আশ্রয় নেয়ার নামই উর্ধ্বগতি। আর তাই আত্মায়, মনে ও দেহে প্রকাশিত হয়ে উর্দ্ধপুণ্ড্র বা তিলক হয়। এর আরেক নাম হরি মন্দির। বৈষ্ণব মাত্রেরই ইহা ধারণ করা উচিত।

তাপ সম্পর্কে স্মৃতি শাস্ত্রে বলা হয়েছে—যিনি চন্দন দ্বারা হরির নাম অংকন করেন তিনি ভগবৎ লোক প্রাপ্ত হন। শ্রী সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ তপ্ত চক্রাদি ধারণ করেন। কিন্তু শ্রী গৌর হরি চন্দন দ্বারা হরিনাম—অঙ্কনের আজ্ঞা প্রদান করেছেন। হরিদাসত্ব বোধক নাম গ্রহণকেই নাম বলা হয়। আর শ্রী হরির পুজাই হল যজ্ঞ। শ্রী বিগ্রহ পুজা পদ্ধতিই বৈষ্ণব যজ্ঞ। কাজেই দেখা যায় দীক্ষিত ব্যক্তির দ্বাদশ অঙ্গে গোপীচন্দনের শীতল তাপ, তিলক ধারণ, ভগবানের দাস্যসূচক নাম, মন্ত্র এবং যজ্ঞ—অর্থাৎ শ্রী শালগ্রাম পুজায় অধিকার—এই পাঁচটি অনুষ্ঠান একান্ত আবশ্যক।

প্রশ্ন : ৭৮৫ ॥ ভগবানের মায়া জয় বা অতিক্রম করার উপায় কি?

উত্তর : এই প্রশ্নের উত্তর গীতাতেই (৭/১৫) স্বয়ং ভগবান দিয়েছেন।

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম্ মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া মেতাং তরন্তি তে।"

অর্থাৎ ভগবান বলছেন, আমার মায়া বদ্ধজীবের পক্ষে অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন। তবে যারা আমার শরনাপন্ন হন তাঁরাই কেবলমাত্র এরূপ মায়া অতিক্রম করতে পারবে। দৈন্য ও শরণাগতির দ্বারাই ভগবানের কৃপা লাভ হয়। মায়াকে জয় করার অন্যতম উপায় হল সাধু-গুরুর কৃপা লাভ। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় বলেছেন—

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধুকৃপা বিনা আর না দেখি উপায় ॥

শ্রীমদ্ ভাগবতে (১১/৬/৪৬) দেখা যায় শ্রী উদ্ধব ভগবান কৃষ্ণকে বলছেন : হে কৃষ্ণ! তোমাকে মাল্য, গন্ধবস্তু, অলঙ্কার ইত্যাদি যা অর্পিত হয়েছে, তাতে ভূষিত হয়ে তোমার দাস স্বরূপ আমরা তোমার উচ্ছিষ্ট ভোজন করতে করতেই তোমার মায়াকে জয় করতে নিশ্চয়ই সমর্থ হবো। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে দেখা যায়—

কৃষ্ণ নিত্যদাস জীব, তাহা ভুলি গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল ॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবণ।
মায়া জাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥
সাধু শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥

প্রশ্ন : ৭৮৬ ॥ কৃষ্ণ তত্ত্ব এবং গৌরতত্ত্ব কি পৃথক?

উত্তর : শ্রী শ্যাম সুন্দর এবং শ্রী গৌর সুন্দর পৃথক তত্ত্ব নন। উভয়ই মধুর রসের আশ্রয়। মধুর রস মাধুয্য এবং ঔদার্য্য—এই দুই

প্রকার। তার মধ্যে মাধুর্য্য যেখানে থাকে সেখানে শ্রী কৃষ্ণ স্বরূপ। আবার ঔদার্য্য যেখানে বর্তমান সেখানে শ্রী গৌরাঙ্গ স্বরূপ। মূল শ্রী বৃন্দাবনে শ্রী কৃষ্ণ পিঠ এবং শ্রী গৌর পিঠ—এই দুইটি পৃথক প্রকোষ্ঠ আছে। শ্রী কৃষ্ণ ভক্তগণ কৃষ্ণ পিঠে অবস্থান করে সেবা করেন। আর শ্রী গৌর ভক্তগণ শ্রী গৌর পিঠে থেকে শ্রী গৌরাঙ্গের সুখ বিধান করেন। সাধনকালে যাঁরা শ্রী কৃষ্ণ এবং শ্রী গৌর—উভয়ের উপাসক তাঁরা সিদ্ধি কালে দুইটি কায় বা নিত্যদেহ অবলম্বন পূর্বক উভয় পিঠে যুগপৎ বর্তমান থেকে উভয়ের সেবা করেন।

প্রশ্ন : ৭৮৭ ॥ কৃষ্ণ লীলা এবং গৌর লীলা কি একই?

উত্তর : শ্রী গৌর সুন্দর স্বয়ংরূপ ভগবান শ্রী কৃষ্ণ। শ্রী শ্যাম সুন্দর কৃষ্ণই ঔদার্য্য লীলা প্রকাশের জন্য শ্রী গৌর সুন্দর রূপে আবির্ভূত হন।

শ্রী কৃষ্ণ লীলা ও শ্রী গৌর লীলা উভয় লীলায়ই নিত্য। শ্রী কৃষ্ণ লীলায় ভজন বিষয় প্রতিভাত। শ্রী গৌর লীলায় সেই ভজনের প্রণালী প্রকাশ করা হয়েছে। প্রণালী ছেড়ে ভজন এবং ভজন ছেড়ে কেবল প্রণালী কখনো সম্পূর্ণ হতে পারে না।

প্রশ্ন : ৭৮৮ ॥ সকল গৌরভক্তই কি উজ্জ্বল রসাশ্রিত?

উত্তর : শ্রী গৌর সুন্দরের সকল ভক্তই উজ্জ্বল মধুর রসের আশ্রিত নন—অর্থাৎ মধুর রসের ভক্ত নন। যেমন শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর সেবক-সম্প্রদায় থেকে শ্রী গৌর সুন্দরের অনুগত শ্রীল রূপ-সনাতনের ভজন-প্রণালী পৃথক। শুদ্ধ ভক্ত এবং অন্তরঙ্গ ভক্ত সমান রসের আশ্রিত নন বলে সকল গৌর ভক্তগণকে উজ্জ্বল রসের আশ্রিত মনে করা ঠিক নয়। শ্রীমন মহাপ্রভুতে সকল রসাশ্রিত ভক্তই আশ্রয় লাভ করেছেন। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে দেখা যায়—

পুরীর বাৎসল্য মুখ্য, রামানন্দের শুদ্ধ সখ্য
গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধ দাস্য রস।
গদাধর-জগদানন্দ, স্বরূপের মুখ্য রসানন্দ
এই চারিভাবে প্রভু বশ

প্রশ্ন : ৭৮৯ ॥ শ্রী গৌর হরি এবং শ্রী কৃষ্ণ কি অভিন্ন, না তাঁদের পৃথক স্বত্ত্বা আছে?

উত্তর : শ্রী গৌর সুন্দর শ্রী কৃষ্ণ। তবে কৃষ্ণ রূপ নন। শ্রী কৃষ্ণের সর্বাঙ্গ যখন রাধারানীর গৌর কান্তিতে আবৃত হয় তখনই শ্রী শ্যামসুন্দর শ্রী গৌর সুন্দরে পরিনত হন। আবার শ্রী গৌর সুন্দর যখন গোপ-রাজের নন্দন হিসাবে লীলা প্রকাশ করেন তখনই তিনি নন্দের নন্দন শ্রী কৃষ্ণ।

শ্রী গৌর সুন্দর কৃষ্ণের রস ও উৎকর্ষের প্রকাশক ও প্রচারক। তিনি ঔদার্য্য রসের বিগ্রহ। শ্রী গৌর সুন্দরের কৃষ্ণ রূপ মাধুর্য্য রসের বিগ্রহ। আস্বাদক বিষয় বিগ্রহ বলে তিনিই কৃষ্ণ। **শ্রী নবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্য** গ্রন্থে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখেছেন—

গৌর কৃষ্ণে ভেদ যার সেই জীব ছার।
শ্রী কৃষ্ণ সম্বন্ধ কভু না হয় তাহার ॥
... ...
রাধা কৃষ্ণ ঐক্য মোর শ্রী গৌরাঙ্গ রায়
যুগল বিলাস ঐক্যে স্বতঃ নাহি ভায় ॥"

প্রশ্ন : ৭৯০ ॥ শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া অথবা লক্ষ্মীপ্রিয়া কি শ্রী গৌর সুন্দরের হ্লাদিনী শক্তি?

উত্তর : শ্রী গৌর ভজন দাস্যরস পরাকাষ্ঠা। যাঁরা মধুর রসের অধিকারী তাঁরা বিপ্রলম্ভ তনু শ্রী গৌরের প্রদর্শিত ও প্রদত্ত আশ্রয়-অবলম্বনগণের অনুসরণে উন্নত উজ্জ্বল রসে কৃষ্ণ ভজন করেন। যেখানে মধুর রসে শ্রী গৌর সুন্দরকে উদ্দেশ্য করে পতি শব্দের প্রয়োগ হয়, উহা শ্রী গৌর সুন্দরের শ্রী কৃষ্ণ রূপ জানতে হবে। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পতিত্বে বৈধবিচারে শ্রী লক্ষ্মীপ্রিয়া বা শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়ার দাসীভাব মাত্র। এখানে মুখ্য রসের আনন্দ শব্দ প্রয়োগ হতে পারে না। শ্রী গৌরাঙ্গের যুগল দুই প্রকার—অর্চ্চন মার্গে শ্রী গৌর-বিষ্ণু প্রিয়া পুজিত হন। আর ভজন মার্গে শ্রী রাধা কৃষ্ণ মিলিত তনু হলেন শ্রী গৌর সুন্দর—শ্রী গৌর-গদাধর রূপে সেবিত হন। (উৎস : নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলী ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ২৩৭)।

প্রশ্ন : ৭৯১ ॥ শ্রী গৌর সুন্দরের কৃপা ছাড়া নাকি ব্রজে শ্রী কৃষ্ণ ভজনের সৌভাগ্য হয় না? একথা কতদূর সত্য?

উত্তর : শ্রী গৌর সুন্দরের কৃপায় জীবের চিৎ বিষয়নী বুদ্ধির উদয় না হলে ব্রজে শ্রী কৃষ্ণ ভজন করবার সৌভাগ্য হয় না। শ্রী গৌর সুন্দরকে ছেড়ে যারা মধুর রসে শ্রী রাধা-কৃষ্ণের ভজন করেন তাঁরা শ্রীমন মহাপ্রভুর অনর্পিত চিরউন্নত-উজ্জ্বল পারকীয় মধুর রস লাভ করতে পারেন না। কলিকালে শ্রী গৌরাঙ্গের চরণ আশ্রয় করে যাঁরা কৃষ্ণ ভজন করেন তাঁরাই ধন্য।

প্রশ্ন : ৭৯২ ॥ শ্রী গৌরের অনুগত না হলে যদি শ্রী রাধা-কৃষ্ণের ভজন সুষ্ঠু না হয় তবে কি পূর্ব আচার্যগণের ভজন হয় নাই?

উত্তর : এই প্রশ্নের উত্তর শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের ভাষায় দেয়া যায় : "শ্রী গৌরাঙ্গ দেবের শ্রী চরণাশ্রয় করত: শ্রী কৃষ্ণ ভজন না করলে পরম-পুরুষার্থ পাওয়া যায় না। শ্রী গৌরাঙ্গের উদয় কালের পূর্বে শ্রীমৎ মাধবেন্দ্রপুরীপাদ প্রমুখ শ্রী কৃষ্ণ ভজন করতেন। তাঁদের ভজন সম্পূর্ণরূপে প্রীতিপ্রদ ছিল। যদিও শ্রী গৌরাঙ্গদেবের বাহ্য প্রকাশ তখন হয় নাই, তথাপি তাঁদের হৃদয়ে প্রভুর ভাবোদয় ছিল।"

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ তার **শ্রী চৈতন্যচন্দ্রামৃত** গ্রন্থে বলেছেন :

হে ভ্রাত! তুমি গোকুলপতি শ্রী কৃষ্ণের পরমভাব বিশিষ্ট নাম উচ্চস্বরে কীর্তন কর অথবা তাঁর জগৎ-মঙ্গল মনোহর মূর্তিই চিন্তা কর, কিন্তু যদি তোমাতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপা দৃষ্টি না হয় তবে সেই মহাপ্রেমরস সম্পর্কে তোমার আশা করাও সম্ভব নয়। এর তাৎপর্য হল সেবা অপরাধী বা নাম অপরাধী বহু জন্ম শ্রবণ-কীর্তন করেও নামপ্রেম লাভ করতে সমর্থ হয় না। কিন্তু যারা শ্রী চৈতন্যের আনুগত্যে শ্রী গৌরজন সঙ্গে তাঁর শিক্ষা-অনুসারে নাম-ভজন করেন, তাঁদের নাম অপরাধ তাড়াতাড়ি দূর হয় এবং নামের ফলে শ্রী কৃষ্ণ প্রেম পাওয়ার পথে আর কোন বাধা-বিপত্তি থাকে না।

প্রশ্ন : ৭৯৩ ॥ শ্রী কুরুক্ষেত্রের নামকরণ কিভাবে হয়?

উত্তর : রাজা সম্বরণের ঔরসে সূর্যের মেয়ে তপতীর গর্ভে কুরু নামক এক রাজা জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি রাজর্ষি ছিলেন। এক সময় তিনি এই ক্ষেত্র কর্ষণ করেছিলেন বলে এর নাম কুরুক্ষেত্র হয়েছে।

প্রশ্ন : ৭৯৪ ॥ শ্রী কুরুক্ষেত্রকে ধর্মক্ষেত্র বলা হয় কেন?

উত্তর : শ্রী কুরুক্ষেত্রে এক সময় শ্রী ব্রহ্মা সমস্ত দেবতাদের সাথে নিয়ে যজ্ঞেশ্বর শ্রী বিষ্ণুর যজ্ঞ করেছিলেন। **বায়ু পুরানে** লিখিত আছে : "সত্যযুগে সৃষ্টির আদিতে এই স্থানে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ যজ্ঞ করেছিলেন। তখন থেকে এই স্থান ব্রহ্মসর নামে পরিচিত হয়। ত্রেতাযুগে পরশুরাম ক্ষত্রিয়ের রক্ত দ্বারা যখন পাঁচটি সরোবর পূর্ণ করেছিলেন তখন এই স্থান রামহৃৎ নামে অভিহিত হয়। দ্বাপর যুগে কুরু রাজা যজ্ঞ, দান এবং মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য এই স্থানে নিজের শরীর ছিন্ন করে এই ভূমিতে বপন করেছিলেন এবং এই স্থানেই হাল-চালনা করেছিলেন। এইজন্য এই স্থানের নাম শ্রী কুরুক্ষেত্র হয়েছে। কলিযুগের আরম্ভে পাঁচটি তীর্থ সন্নিহতি, থানেশ্বর, রুদ্রকূপ, চিত্র মুখ্য এবং কুরুক্ষেত্র বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই জন্য এই স্থান চার যুগেই পরমতীর্থ বলে পরিগণিত।"

প্রশ্ন : ৭৯৫ ॥ কলিকালে নাকি সন্ন্যাস নেই? একথা কতদূর সত্য?

উত্তর : প্রথমেই জানা দরকার কর্মীর কর্ম সন্ন্যাস, জ্ঞানীর জ্ঞান সন্ন্যাস এবং ভক্তের যুক্তবৈরাগ্য সন্ন্যাস গ্রহণ এক নয়। **অশ্বমেধং গভালম্ভং সন্ন্যাসাৎ**—শ্লোকে কলিতে কর্ম সন্ন্যাস নিষিদ্ধ হয়েছে। জ্ঞানীর সন্ন্যাস হল ফল্গু সন্ন্যাস। কর্ম সন্ন্যাস ও জ্ঞান সন্ন্যাসে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয় তর্পনের কোন কথা নেই। উভয়ই সুখ-শান্তির জন্য ব্যস্ত। কিন্তু ভক্তের সন্ন্যাস কৃষ্ণের ইন্দ্রিয় তর্পনের জন্য। এখানে নিজের ইন্দ্রিয় সুখ-ভোগের কোন কথা নেই। এরূপ সন্ন্যাস যুক্ত-বৈরাগ্যময়-সেবাময়।

শ্রী কৃষ্ণের সুখের জন্যই ভক্ত ভোগের প্রতি লক্ষ্য রেখে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই বরং জড়জাগতিক ভোগ ত্যাগ করেন। শ্রীমদ্ ভাগবতের ১১তম খণ্ডে অবন্তী নগরের ত্রিদণ্ডী ভিক্ষুর উপাখ্যানে ত্রিবেনু বা ত্রিদণ্ডের কথা উল্লেখ আছে। শ্রীমদ্ ভাগবত ত্রিদণ্ড গ্রহণ পূর্বক হরি ভজনকেই সব ধরনের সাধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলেছেন। **মনুসংহিতায়** দেখা যায় যাঁর বাক্ দণ্ড, মনোদণ্ড এবং কায়দণ্ড বুদ্ধিতে নিহিত তিনিই যথার্থ ত্রিডণ্ডী। কাজেই কলিকালে ত্রিডণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণে কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন : ৭৯৬ ॥ কর্মীগনের মতো বৈষ্ণবেরও কি প্রায়শ্চিত্ত বিধি আছে?

উত্তর : ভগবৎ ভক্তগণ সম্বন্ধ জ্ঞান বিশিষ্ট। কাজেই স্বভাবতই তাদের কোন নিষিদ্ধ পাপাচারে মতি হয় না। যদি কোন কারণে কোন অবস্থায় পাপাচার স্পর্শ করে তবে ভগবান তাঁদেরকে কোন প্রায়শ্চিত্ত না করাইয়া শুদ্ধ করে নেন। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে—

> **বিধিধর্ম্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ।**
> **নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন ॥**
> **অজ্ঞানে বা হয় যদি পাপ উপস্থিত।**
> **কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করে, না করায় প্রায়শ্চিত্ত ॥**

শ্রীমদ্ ভাগবতে (১১/৫/৩৮) উক্ত হয়েছে : অন্যভাব পরিত্যাগ করে যিনি শ্রী হরির পাদমূল ভজন করেন, সেই প্রিয় ব্যক্তির যদি কখনও কোন প্রকারে পাপ উপস্থিত হয় পরমেশ্বর শ্রী হরি তাঁর হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়ে সেই পাপ বিনষ্ট করে থাকেন। কাজেই দেখা যায় শ্রীহরির ভক্তদের জন্য কর্মীগণের মতো পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় না।

প্রশ্ন : ৭৯৭ ॥ ব্রাহ্মণগণ মানুষের পাপের ক্ষয় করার জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দেন। আসলে এই প্রায়শ্চিত্ত জিনিসটি কি?

উত্তর : ইহলোকে যে সকল ব্রত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জ্ঞানকৃত, অজ্ঞানকৃত অথবা পূর্ব জন্মের দেহগত বা মনোগত পাপ ক্ষয় করার জন্য চেষ্টা করা হয় তাকে প্রায়শ্চিত্ত বলে। মনুসংহিতার ১১তম অধ্যায়ে

এবং স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচায্যের অষ্ট বিংশতি তত্ত্বের অন্যতম প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বে এবং পুরাণ, তন্ত্র, সংহিতা ইত্যাদি বইতে ভিন্ন ভিন্ন পাপের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায়। আবার এক পাপেরই সামর্থ এবং অসামর্থ পক্ষে অনেক ধরনের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা রয়েছে। শাস্ত্রবিহিত ধর্মাচরণ না করলে, নিন্দিত কাজ কর্ম করলে এবং ইন্দ্রিয় বিষয়ে আসক্ত হলে মানুষকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। তবে এসব প্রায়শ্চিত্ত জগতের সাধারণ কর্মীগণের জন্যই প্রযোজ্য।

প্রশ্ন : ৭৯৮ ॥ আজকাল কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় মঠে বসবাসরত ভক্তগনের মধ্যেও পরস্পর কলহ, কোন্দল এবং পরনিন্দা, পরচর্চা দেখতে পাওয়া যায়। এর আসল কারণ কি?

উত্তর : শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের ভাষায় এর উত্তর হল : "মঠবাসীগণের প্রত্যেকেরই সর্বক্ষণ শ্রী হরি-গুরু বৈষ্ণবের সেবা, হরিকথা শ্রবণ, কীর্তন ও হরিকথা আলোচনায় নিযুক্ত থাকা কর্তব্য। এসব থেকে বিমুখ হলেই সংসার বাসনায় পুনরায় বন্ধন হওয়ার সম্ভাবনা। তখন অন্য কোন অভিলাষ চরিতার্থ করার বাসনা, পরচর্চা, পরস্পর কলহ ও কোন্দল ইত্যাদি কাজে দিন কাটিয়া যাইবে। মঠবাসীগণ বৈষ্ণব সেবাকে সর্বপ্রধান মঙ্গলের কাজ বলিয়া বুঝিতে না পারিলে ভজন রাজ্যে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে পারিবেন না। নিষ্কপটভাবে শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের প্রীতির জন্য কায়মনোবাক্যে অনুশীলন করিতে হইবে। **বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়, এহেন পামর প্রতি হবেন সদয়**—এই কথা সর্বক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে।"

উপরোক্ত বিষয়সমূহ যে সব মঠে নেই—সেখানেই মঠবাসীগণের মধ্যে পরনিন্দা, পরচর্চা, কোন্দল ও কলহ সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন : ৭৯৯ ॥ কোন ভক্ত স্বপথ থেকে বিচ্যুত হলে অন্য ভক্তদের কি করা উচিত হবে?

উত্তর : সতীর্থগণের মধ্যে কাউকে শ্রী হরি-গুরু বৈষ্ণবের সেবা থেকে বিচ্যুত হতে দেখলে এবং অন্য কোন ভক্ত অধঃপতিত হয়েছে

বুঝতে পারলে তাকে সরলভাবে হরি ভজনের কথা ভালভাবে বুঝাইয়া, শ্রী গুরু গৌরাঙ্গের বাণী তাঁর কাছে কীর্তন করে তাঁকে সর্বক্ষণ শ্রী হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবায় নিয়োজিত রাখতে হবে। তাঁকে হরি কথা বলে কৃপা করতে হবে। ভক্তের অধঃপতনে কটাক্ষ করে আনন্দ লাভ করা তাদের জন্য মঙ্গলপ্রদ নয়।

প্রশ্ন : ৮০০ ॥ বৈষ্ণবের কি কি লক্ষণ আছে?

উত্তর : শ্রী গৌরসুন্দর শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে বৈষ্ণবের কি কি লক্ষণ থাকা দরকার সে সম্পর্কে বলেছেন—

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন ॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত ষড়্গুণ ॥
মিতভুক, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী ॥

উপরোক্ত ৬টি লক্ষণ দ্বারা বৈষ্ণব চিনতে পারা যায়। এসব গুণের মধ্যে কৃষ্ণের শরণ-অর্থাৎ কৃষ্ণের শরনাগতই বৈষ্ণবের স্বরূপ লক্ষণ। অন্যসব তটস্থ লক্ষণ। কারণ কৃষ্ণ ভক্তে কৃষ্ণের সকল গুণের সঞ্চার হয়।

প্রশ্ন : ৮০১ ॥ দীক্ষা গুরু ও শিক্ষা গুরুর মধ্যে কে বড়?

উত্তর : যিনি মন্ত্র দেন তিনি দীক্ষা গুরু। তিনি ভগবানের সাথে জীবের সম্বন্ধ জ্ঞান প্রদান করেন। শিক্ষা গুরু হরি ভজনের কথা বলেন। কি করে ভজন করতে হয় তার শিক্ষা দেন। দীক্ষা গুরু ও শিক্ষা গুরু একই বস্তু। এদের মধ্যে কে বড়, কে ছোট বলে কোন কথা নাই। কারণ উভয়ই ভগবৎ প্রেষ্ঠ। ভগবৎ প্রেষ্ঠদের মধ্যে ছোট বড় ভেদ করলে অপরাধ হবে। কারণ দীক্ষা গুরুও শিক্ষা গুরু হতে পারেন। অনর্থ নিবৃত্তির পর বিশুদ্ধ কথা শিক্ষা গুরু বলেন। এমনকি স্বরূপ সিদ্ধির পরও শিক্ষা গুরুর সাহচর্য্য গ্রহণ করতে হয়।

প্রশ্ন : ৮০২ ॥ গুরু কি জীবতত্ত্ব, না বিষ্ণু তত্ত্ব?

উত্তর : গুরু জীবতত্ত্ব নন। অর্থাৎ তিনি কোন সাধারণ জীব নন। মুক্ত জীবরূপেও গুরুকে আখ্যায়িত করা যাবে না। তিনি বিষ্ণু তত্ত্ব—তিনি ভগবানের সাথে অভিন্ন—সেবক ভগবান। তিনি ভগবানের প্রিয়তম সেবক। ভগবানের সাথে তাঁর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। গুরুকে জীবরূপে দর্শন করলে অপরাধ হবে। তিঁনি নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ পার্ষদ। তাই জীবজাতীয় নন। ভগবানের পার্ষদ বা পরিকরই গুরু। তখন তাঁকে জীব বলা চলে না। শ্রী গুরুদেব শক্তিমান নন, তিনি কৃষ্ণের শক্তি-স্বরূপ শক্তি আশ্রয় বিগ্রহ।

প্রশ্ন : ৮০৩ ॥ শাস্ত্রে বলা হয়েছে অপরাধ শুন্য হয়ে লহ কৃষ্ণনাম। এখানে অপরাধ বলতে কি বুঝানো হয়েছে?

উত্তর : অপরাধ দশটি যা নিম্নরূপ—

১. বৈষ্ণব-বিদ্বেষ ও বৈষ্ণব নিন্দা
২. শিবাদি অন্য দেবতাকে কৃষ্ণ থেকে পৃথক ঈশ্বর জ্ঞান।
৩. গুরুকে অবজ্ঞা করা।
৪. শ্রুতি শাস্ত্রের নিন্দা।
৫. শ্রী হরিনামে অর্থবাদ।
৬. নামের বলে পাপ-আচরণ।
৭. নাম প্রভুর কাছে ভোগ ও মোক্ষরূপ ফলের আশা।
৮. অশ্রদ্ধাবান ও বিমুখ ব্যক্তিকে হরিনাম প্রদান।
৯. শ্রী নামের মাহাত্ম্য শুনেও শ্রী নামে অবিশ্বাস ও অরুচি।
১০. শরীরগত অভিমান করে শ্রী নাম গ্রহণ।

উপরোক্ত দশ প্রকার অপরাধ শুন্য হয়ে হরিনাম করতে হয়। তাহলেই নাম প্রভুর কৃপা পাওয়া যায়।

প্রশ্ন : ৮০৪ ॥ শাস্ত্রে আছে কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি অনাচার। এখানে অনাচার বলতে কি বুঝানো হয়েছে?

উত্তর : চুরি করা, মিথ্যা কথা বলা, কপটতা, বিরোধ, লাম্পট্য, জীব হিংসা ও কুটিনাটী ইত্যাদি নিজের এবং সমাজের জন্য অহিতকর

কাজকর্মই অনাচার। এই সমস্তই ব্যক্তি এবং সমাজ জীবন কলুষিত করে। কাজেই এই সমস্ত পরিত্যাগ করে এখানে সংসার ধর্ম পালনের উপদেশ দেয়া হয়েছে। এককথায় উপরোক্ত সব ধরনের অনাচার ছেড়ে সদুপায়ের দ্বারা সংসার ধর্ম পালন করার কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন : ৮০৫ ॥ শ্রী মথুরাধাম ভগবানের অন্যতম প্রধান লীলা ক্ষেত্র। শ্রী মথুরা শব্দের অর্থ কি?

উত্তর : শ্রী পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে—

মাথুর শব্দ যথাক্রমে ম-কার, থু-কার এবং র-কার থেকে উৎপন্ন হয়েছে বলে ওঁ কার তুল্য। অর্থাৎ ওঁ-কার যেরূপ অ-কার বিষ্ণু স্বরূপ, উ-কার মহারুদ্র স্বরূপ এবং ম-কার ব্রহ্মা স্বরূপ—এই তিন অক্ষর যোগে উৎপন্ন হয়ে তদাত্মক বলে কথিত, মথুরা শব্দও সেই রূপ। এজন্য সত্য সত্যই সেই শ্রেষ্ঠতম ক্ষেত্র মথুরাপুরী ত্রিদেবময়ী মূর্ত্তিরূপে নিত্য বিরাজিত।

প্রশ্ন : ৮০৬ ॥ শ্রী মথুরাপুরী কে নির্মাণ করেছিলেন?

উত্তর : শ্রী রামায়ণে বর্ণিত আছে—লোনার জৈষ্ঠপুত্র মধু দৈত্য মহাদেবকে তপস্যা দ্বারা সন্তুষ্ট করে একটি অপূর্ব ত্রিশূল প্রাপ্ত হন। মহাদেব মধু দৈত্যকে এই বর দেন যে যতদিন তোমার পুত্রের হাতে এই শূল থাকবে তত দিন কেউ তোমাকে বধ করতে পারবে না। এই বর লাভ করে মধু এক সুন্দর পুরী নির্মাণ করেন যা মধুর নাম অনুসারে মধুপুরী নামে খ্যাত হয়। এক সময় মধু দৈত্যের পুত্র লবনাসুরের অত্যাচার থেকে মুনিদেরকে রক্ষার জন্য শ্রী রামচন্দ্রের আজ্ঞায় শ্রী শত্রুঘ্ন লবনাসুরকে ত্রিশূল হীন করে বধ করেন। তারপর থেকে এই দেব নির্মিত পুরী মধুরপুরী, মথুরা ও শূরসেনা নামে খ্যাত হয়।

প্রশ্ন : ৮০৭ ॥ শ্রী মথুরা ধামকে রক্ষার জন্য নাকি চারজন ক্ষেত্রপাল আছেন? তাদের পরিচয় কি?

উত্তর : চারজন ক্ষেত্রপাল বা নগর রক্ষক শ্রী বিষ্ণুধাম মথুরা নগরীকে রক্ষা করছেন। এই চারজন হলেন মথুরানাথ শ্রী কৃষ্ণের প্রিয় চার মহাদেব মূর্ত্তি। পূর্ব দিকে পিপ্পলেশ্বর, পশ্চিমে—ভূতেশ্বর, উত্তরে—গোকর্নেশ্বর এবং দক্ষিণে—রঙ্গেশ্বর।

প্রশ্ন : ৮০৮ ॥ শ্রী মথুরা ধামের সর্বশেষ রাজা কে ছিলেন?

উত্তর : ভগবান শ্রী কৃষ্ণ তাঁর অপ্রকট লীলা প্রকাশ করলে কলি জগতে প্রবেশ করে। কলিকাল উদিত প্রায় দেখে পাণ্ডবগণ শ্রী কৃষ্ণের প্রপৌত্র (নাতি) শ্রী বজ্রনাভকে দ্বারকা থেকে এনে শ্রী মথুরার রাজা করেন। শ্রী কৃষ্ণের এক পুত্র প্রদ্যুন্ম'। তাঁর পুত্র হলেন অনিরুদ্ধ। আর অনিরুদ্ধের পুত্র হলেন বজ্রনাভ।

প্রশ্ন : ৮০৯ ॥ শাস্ত্রে সরাগ বক্তা এবং নীরাগ বক্তার কথা শুনা যায়। এসম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর : আমরা শাস্ত্রে সরাগবক্তা এবং নীরাগ বক্তা—এই দুই শ্রেণীর বক্তার কথা শুনতে পাই। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু তার **ভক্তি সন্দভ** গ্রন্থে বলেছেন : সরাগবক্তা জড়জাগতিক বস্তুতে লোভী, কনক-কামিনী ও প্রতিষ্ঠার কাঙ্গাল। তার কথা হৃদয় স্পর্শ করে না। তাঁর কথার মধ্যে অপ্রাকৃত কোন শক্তি নেই। সে তার কথার মাধ্যমে অপরের সংসার বাসনা, ভূক্তি ও মুক্তি স্পৃহা দূর করতে পারে না। এই ধরনের ব্যক্তি মানুষকে কেবল উপদেশই দেন, কিন্তু নিজে তা আচরণ করে নিজের জীবনে পরীক্ষা করেন না। তিনি যা বলেন তাতে তার নিজেরই সুদৃঢ় বিশ্বাস নেই। একথায় সরাগ বক্তা আচারহীন ধর্ম প্রচারক, বাক্য বাগীশ ও পরকে উপদেশ দেয়ার ব্যাপারে করিৎকর্মা ও পণ্ডিত। তার উপদেশ কেবল নিজের লাভ, পুজা ও প্রতিষ্ঠার জন্য।

নীরাগ বক্তা ভক্তি সিদ্ধান্তে সুদৃঢ় এবং আচারবান। তিনি অকিঞ্চন, ভগবানের শরনাগত এবং ভগবৎ সেবায় নিবেদিত আত্মা। তিনি ভগবানের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। একমাত্র নীরাগবক্তাই শ্রবণ গুরু হতে পারেন। তিনি সকলের মঙ্গল কামনা সব সময় করে থাকেন।

প্রশ্ন : ৮১০ ॥ শ্রবণ গুরু কে হতে পারেন?

উত্তর : শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী তাঁর **শ্রী ভক্তি সন্দর্ভ** গ্রন্থে বলেছেন : কাম ও ক্রোধ যুক্তব্যক্তি, জাগতিক শোক ও মোহে আচ্ছন্ন এবং ভোগের অভাবে দুঃখিত ব্যক্তি প্রমুখ যাঁর কথা শুনে জীবনী শক্তি লাভ করতে পারে, মৃত অবস্থা থেকে চেতন-অবস্থায় পৌছতে পারে, সেরূপ

বক্তাই পরম গুরু—অর্থাৎ শ্রবণ গুরু হতে পারেন। লৌকিক শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি শ্রবণ গুরু হতে পারেন না। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার উন্নতস্তরে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিই শ্রবণ গুরু হতে পারেন।

প্রশ্ন : ৮১১ ॥ মনই কি আত্মা? যদি না হয় তবে এদের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : মন আত্মা নয়। মন পরিবর্তনশীল, কিন্তু আত্মা অপরিবর্তনীয় এবং নিত্য। মনের কাজ-ভোগ অথবা নির্ভোগ। আত্মার কাজ-ভগবানের সেবা করা। মন এই জগতের বস্তু বা তৃতীয় মানের বস্তু পর্যন্ত জানতে পারে। চতুর্থ মানের বস্তু—অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ বস্তু জানবার শক্তি মনের নেই। মন হল কুণ্ঠবস্তু। তাই বৈকুণ্ঠের সন্ধান কি করে পাবে? আত্মাই বৈকুণ্ঠের অভিজ্ঞান প্রাপ্ত হতে পারে।

প্রশ্ন : ৮১২ ॥ একাদশীতে অন্ন ভোজন করলে কি হয়?

উত্তর : একাদশীকে শ্রী হরিবাসর বলা হয়। ব্রহ্ম হত্যা তুল্য যাবতীয় পাপ এই হরিবাসর দিনে অন্নকে আশ্রয় করে অবস্থান করে। কাজেই যে ব্যক্তি একদশীতে ভোজন করে সে পৃথিবীর যাবতীয় পাপই ভোজন করে থাকে। **স্কন্দপুরান** বলেনঃ যে ব্যক্তি একাদশীতে ভোজন করে, সে মাতৃ হত্যা, পিতৃ হত্যা, ভ্রাতৃ হত্যা ও গুরু হত্যার পাতকী হয়। এই কারণে যমদূতগণ মৃত্যুর পর অগ্নিতে প্রজ্জলিত ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ম লোহার অস্ত্র তার মুখে নিক্ষেপ করে। মোহবশত বা ভুলেও যদি কেউ ভোজন করে তাহলেও সে পাপ থেকে মুক্ত হয় না।

প্রশ্ন : ৮১৩ ॥ কোন লোক সবসময় একাদশীব্রত পালন করেন। কিন্তু একাদশী ব্রত উপস্থিত হওয়ার পূর্বে যদি তিনি অসুস্থ্য অবস্থায় হাসপাতালে অবস্থান করেন তবে তার করণীয় কি হবে?

উত্তর : **শ্রীবরাহ পুরাণ** থেকে জানা যায়—দেহের অসামর্থ্য অবস্থায় একাদশীব্রত উপস্থিত হলে নিজের স্ত্রী, পুত্র, অথবা বোন বা ভাইকে উপবাস করালে তাঁর ব্রত নষ্ট হয় না। অর্থাৎ তাঁর বদলে একাদশীব্রতে বিশ্বাসী পরিবারের কোন ব্যক্তি এই ব্রত যথাযথভাবে পালন করলে অসুস্থ্য ব্যক্তির একাদশী ভঙ্গ হবে না।

প্রশ্ন : ৮১৪ ॥ একাদশীতে যে অনুকল্প নেয়ার ব্যবস্থা আছে তা কাদের জন্য?

উত্তর : একাদশীতে সামর্থবান ব্যক্তি দিবারাত্রি নিরম্বু উপবাস করবেন (অর্থাৎ নির্জলা উপবাস করবেন)। অসমর্থ ব্যক্তির জন্য কিছু অনুকল্পের ব্যবস্থা আছে। বালক, অতি বৃদ্ধ, আতুর, রোগগ্রস্ত এবং যাঁর পিত্তাধিক্য আছে—এরূপ ব্যক্তি একবার মাত্র দুধ এবং ফলাদি আহার করতে পারেন। কারণ হল ফল, মূল, দুধ এবং গুরু বাক্য ইত্যাদিতে ব্রত নষ্ট হয় না।

প্রশ্ন : ৮১৫ ॥ দশমীবিদ্ধা একাদশী করলে কি দোষ?

উত্তর : কোন লোকই দশমী বিদ্ধা একাদশী করবেন না। এরূপ করলে সন্তান নষ্ট হয় এবং মৃত্যুর পর নরক লাভ করতে হবে। এরূপ ব্যক্তির শত বছরের পুণ্য নষ্ট হয়। দশমী বিদ্ধা একাদশী করায় কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে শতপুত্রের বিয়োগের দুঃখ ও শোক বহন করতে হয়েছিল।

প্রশ্ন : ৮১৬ ॥ ভূঃ, ভূর্ব, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য—এই সাতটি লোকের মধ্যে মৃত্যুর পর কে কোন্ লোকে স্থান লাভ করবে?

উত্তর : চেতনের বিকাশ অনুসারে জীবের সেবাবৃত্তির প্রকাশ হয় এবং তার ফলে প্রাপ্য লোকেরও তারতম্য হয়। যারা গৃহস্থ অথচ সকাম পুণ্যকামী তারা ভূঃ, ভূর্ব এবং স্বঃ—এই তিনলোকের কোন একটি লোকে মৃত্যুর পর পৌছতে পারবেন। গৃহস্থ নয় এমন ব্যক্তিদের প্রাপ্য স্থান হল মহঃ, জনঃ, তপঃ এবং সত্য লোক। যাঁরা নির্দিষ্ট সময়ে গুরু দক্ষিণা প্রদান করে গৃহে ফিরে আসেন তাদের প্রাপ্য স্থান হল মহর্লোক। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী—অর্থাৎ যারা আজীবন ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করেন তাঁদের প্রাপ্যস্থান হল জনলোক। বানপ্রস্থ আশ্রমে থাকা ব্যক্তিগণের প্রাপ্য স্থান হল তপোলোক। আর যাঁরা সন্ন্যাসী তাদের প্রাপ্যস্থান সত্যলোক। কিন্তু যাঁরা ভগবৎ ভক্ত তাঁরা দুর্লভ বৈকুণ্ঠলোক লাভ করেন। এই বৈকুণ্ঠবাসী ভক্তগণ অপেক্ষাও প্রীতির উৎকর্ষ অনুসারে দ্বারকা, মথুরা এবং গোলোক-বৃন্দাবনের ভক্তগণ ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠ।

প্রশ্ন : ৮১৭ ॥ যারা মাংসভোজী তাদের মধ্যে অনেকেই বলেন যে তিনি নিজেতো পশু হত্যা করেন নাই। তাই তার পাপ হবে কেন?

উত্তর : পশু বধ অনেক প্রকারে হতে পারে। কেবল নিজের হাতে হত্যা করলেই পশু বধ হয় না। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, পশু হত্যার অনুমোদনকারী, নিহত পশুর মাংস বিভাগকারী, হত্যাকারী নিজে, মাংস ক্রয় ও বিক্রয়কারী, পাচক, পরিবেশক এবং ভক্ষণকারী—এই প্রত্যেকেই ঘাতক শ্রেণী ভুক্ত। কর্মশাস্ত্রে যে যজ্ঞাদিতে পশু হত্যার ব্যবস্থা দেখা যায় তা কেবল জীবের স্বাভাবিক লালসা কমানোর মাধ্যমে নিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই–এই কথা জানা দরকার।

প্রশ্ন : ৮১৮ ॥ শ্রীধাম বৃন্দাবনে কতটি মন্দির আছে এবং এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্দির কয়টি এবং তাদের নাম কি কি?

উত্তর : শ্রীধাম বৃন্দাবনে ৫ হাজারেরও বেশি মন্দির আছে। তবে এদের মধ্যে সাতটি মন্দির হল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

১. শ্রীল সনাতন গোস্বামীর মদনমোহন মন্দির।
২. শ্রীল রূপ গোস্বামীর গোবিন্দ দেব মন্দির।
৩. শ্রীল মধুপণ্ডিত গোস্বামীর রাধা-গোপীনাথ মন্দির।
৪. শ্রীল জীব গোস্বামীর রাধা দামোদর মন্দির।
৫. শ্রীল শ্যামানন্দ পণ্ডিত গোস্বামীর রাধা-শ্যামসুন্দর মন্দির।
৬. শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর রাধা-রমন মন্দির।
৭. শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর রাধা-গোকুলানন্দ মন্দির।

প্রশ্ন : ৮১৯ ॥ ভগবানের দ্বিতীয় লীলা অবতার হলেন শ্রী কূর্মদেব। তাঁর কি কোন মন্দির আছে? থাকলে কোথায়?

উত্তর : হ্যাঁ। দক্ষিণ ভারতের কূর্মক্ষেত্র নামক এক পবিত্র স্থানে ভগবান শ্রী কূর্মদেবের মন্দির রয়েছে। সারা পৃথিবীতে শ্রী কূর্মদেবের এই একটিই মন্দির আছে।

প্রশ্ন : ৮২০ ॥ ভেট দ্বারকা কি?

উত্তর : ভেট একটি গুজরাটী শব্দ যার অর্থ হল দ্বীপ। মূল দ্বারকা থেকে ৩০ মাইলেরও বেশি দুরে এই দ্বীপে একটি প্রাচীন দ্বারকাধীশ মন্দির আছে। এই দ্বীপের লোকজন দাবী করেন যে এই ভেট দ্বারকাই আসল দ্বারকা।

প্রশ্ন : ৮২১ ॥ শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ যে গোপাল বিগ্রহ পেয়েছিলেন সেই বিগ্রহ এখন কোথায় রয়েছেন?

উত্তর : শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই শ্রী গোপাল বিগ্রহ মাধবেন্দ্র পুরী পাদকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে তাঁকে মাটির নিচ থেকে উঠিয়ে সেবা পুঁজার বন্দোবস্ত করতে বলেন। সে অনুযায়ী শ্রী পুরীপাদ তাই করেন। এই বিগ্রহ আগে বৃন্দাবনের গিরি গোবর্ধনের পাদদেশে যতীপুরা গ্রামে ছিলেন। কিন্তু সপ্তদশ শতকে বৃন্দাবনের বিভিন্ন মন্দিরের উপর মোঘলদের আক্রমনের সময় ঐ বিগ্রহকে রাজস্থানে নিয়ে আসা হয়। কথিত আছে যে বৃন্দাবনের গোবর্ধন থেকে গোপাল বিগ্রহকে গোপনে রাজস্থানের বর্তমান জায়গায় সরিয়ে আনতে ৩২ মাস সময় লেগেছিল। যাত্রাপথে প্রায় ৬ মাস এই বিগ্রহ আগ্রায় অবস্থান করেছিলেন। বর্তমানে মাধবেন্দ্র পুরীপাদের সেই গোপাল বিগ্রহ শ্রী নাথজী নামে ভারতের রাজস্থানের পারাবল্লী পর্বত মালার পাদদেশে সিংহাদ নামক এক স্থানে বিরাজিত আছেন।

প্রশ্ন : ৮২২ ॥ পুষ্কর তীর্থকে ব্রহ্মার ভূমি বলা হয় কেন?

উত্তর : একবার জগৎ সৃষ্টির জন্য পরমেশ্বর ভগবান থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্রহ্মার ইচ্ছা হলো যে পৃথিবীর কোন একটি স্থান তাঁর জন্য উৎসর্গ হোক। এই লক্ষ্যে তিনি একটি পদ্মফুলের তিনটি পাপড়ি পৃথিবীতে নিক্ষেপ করলেন। সেই পাপড়ি তিনটি যখন পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করলো তখন সেখানে তিনটি সরোবর সৃষ্টি হয়। এই সরোবর তিনটি ব্রহ্মার কর—অর্থাৎ হাত থেকে ছোড়া তিনটি ফুল থেকে সৃষ্টি হয়েছিল বলে এই স্থানটি পুষ্কর নামে খ্যাত হয়। এই সরোবর তিনটি যথাক্রমে জৈষ্ঠ্য পুষ্কর মধ্য পুষ্কর এবং কনিষ্ঠ পুষ্কর নামে পরিচিত।

প্রশ্ন : ৮২৩ ॥ জড়জগতের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার পুঁজা নাকি কেবলমাত্র কার্ত্তিক মাসেই করা যায়। কেন?

উত্তর : ব্রহ্মার স্ত্রী সরস্বতী কোন এক কারণে ব্রহ্মাকে এই বলে অভিশাপ দেন যে কেবলমাত্র কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথি ছাড়া তিঁনি আর কখনো পুঁজিত হবেন না।

পদ্ম পুরানের সৃষ্টিখণ্ডের ১৭তম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে একবার দেবতা ও ব্রাহ্মণদেরকে সাথে নিয়ে এক যজ্ঞ করার জন্য ব্রহ্মা পুষ্কর নামক এক জায়গায় গিয়েছিলেন। ঐ যজ্ঞের নিয়ম ছিল স্ত্রীকে নিয়ে যজ্ঞ করতে হবে। ব্রহ্মা তখন তাঁর স্ত্রী সরস্বতীকে আনার জন্য নারদ মুণিকে পাঠান। কিন্তু কোন কারণে ঐ সময় সরস্বতী সেখানে যেতে অপারগ ছিলেন। তখন ব্রহ্মা ইন্দ্রকে যজ্ঞের সহায়তার জন্য একজন উপযুক্ত স্ত্রী প্রদানের জন্য বললে ইন্দ্র একজন গোপকন্যাকে পাঠান। কিন্তু যজ্ঞের জন্য একজন ব্রাহ্মণ কন্যার প্রয়োজন ছিল। তাই দেবতারা ঐ গোপকন্যাকে একটি গাভীর মুখের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে তার পশ্চাৎভাগ দিয়ে বের করে এনে কন্যাটিকে পরিশুদ্ধ করে আনলেন—অর্থাৎ তাকে উন্নত কুলে উন্নীত করলেন। কারণ বৈদিক সংস্কৃতিতে গাভীকে ব্রাহ্মণের মতই শুদ্ধ এবং উন্নত শ্রেণীর বলে মনে করা হয়। ঐ কন্যা তখন গায়ত্রী নামে পরিচিত হন—অর্থাৎ যাকে একটি গাভীর মধ্যদিয়ে টেনে আনা হয়েছিল।

কিছুক্ষণ পর সরস্বতী যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন যে তাঁর স্বামী ব্রহ্মার পাশে অন্য একজন নারী বসে আছেন। তখন রাগে এবং দুঃখে তিনি উপরের অভিশাপ ব্রহ্মাকে দিয়েছিলেন। সেই অনুযায়ী ব্রহ্মার পুঁজা কেবলমাত্র কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতেই হয়।

প্রশ্ন : ৮২৪ ॥ ভগবান শ্রী বরাহদেবের কোন মন্দির কি রয়েছে? থাকলে কোথায়?

উত্তর : শ্রী বরাহদেবের মন্দির ভারতের রাজস্থানের অন্তর্গত পুষ্কর তীর্থে রয়েছে। এই তীর্থের একটি ছোট পাহাড়ের উপর তাঁর মন্দির আছে। সেখানে আছেন শ্বেত পাথরে নির্মিত ভগবানের বরাহ অবতার।

এই বিগ্রহ দক্ষিণমুখী। মন্দিরের বর্তমান বিগ্রহ ১৭৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। শোনা যায় আদি মন্দিরটি ছিল ১৫০ ফুট। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মোঘলরা এই আদি মন্দিরকে তিনবার আক্রমণ করে ধ্বংস করে দিয়েছিল।

প্রশ্ন : ৮২৫ ॥ বৈষ্ণবরা চারিধামের জয়ধ্বনি দিয়ে থাকেন। এই চারিধাম কি এবং কোথায় কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য ভগবানের ভৌম লীলাস্থলের চারদিকে চারটি ধাম স্থাপন করে ভারতবর্ষকে সুরক্ষিত করেন। পূর্বদিকে শ্রীক্ষেত্র পুরী ধামে শ্রী জগন্নাথ, পশ্চিম দিকে দ্বারকায় শ্রী দ্বারকাধীশ, উত্তর দিকে বদরিকাশ্রমে শ্রী বদ্রীনাথ এবং দক্ষিণ দিকে রামেশ্বরে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র। ভগবান তাঁর লীলা বিলাসের লক্ষ্যে এই চারধামে চার ধরনের লীলা সম্পাদন করেন। এই সম্পর্কে প্রচলিত একটি প্রবাদ আছে : ভগবান বদরিকাশ্রমে স্নান করেন, দ্বারকা ধামে বেশ ধারণ করেন, পুরীধামে ভোজন করেন এবং রামেশ্বরে শয়ন করেন।

প্রশ্ন : ৮২৬ ॥ কোন্ তিথিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ভগবদ্-গীতা উপদেশ দিয়েছিলেন?

উত্তর : আজ থেকে পাঁচ হাজার বছরের কিছু বেশি পূর্বে **মোক্ষদা একাদশী** তিথিতে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে উদ্যত পাণ্ডব এবং কৌরব পক্ষের মাঝখানে রথের উপরে বসে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখা অর্জুনকে ভগবদ্ গীতা উপদেশ দিয়েছিলেন। তাই এই দিনটিকে **গীতা জয়ন্তী** দিনও বলা হয়।

প্রশ্ন : ৮২৭ ॥ মহারাজ কুরু কিভাবে কুরুক্ষেত্রে হাল দ্বারা ভূমি কর্ষণ করেছিলেন?

উত্তর : মহারাজ কুরু একটি সোনার রথে চড়ে কুরুক্ষেত্রে এসেছিলেন। তিনি তাঁর রথের স্বর্নকে একটি স্বর্নের লাঙ্গল তৈরীর জন্য ব্যবহার করেছিলেন। এরপর তিনি ভগবান শিবের কাছ থেকে তাঁর বলদ (বৃষ) এবং যমের কাছ থেকে তাঁর মহিষ ধার নিয়ে ঐ ভূমিতে হাল-চালনা করেছিলেন।

প্রশ্ন : ৮২৮ ॥ কি উৎপাদনের জন্য মহারাজ কুরু কুরুক্ষেত্রে হল কর্ষণ করেছিলেন?

উত্তর : স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্র যখন মহারাজ কুরুকে জিজ্ঞাসা করেন যে কি জন্য তিনি হলকর্ষণ করছেন তখন তিনি (কুরু মহারাজ) উত্তর দেন যে আটটি ধর্মীয় সদ্‌গুণ উৎপন্ন করার জন্য তিনি এই কাজ করছেন। সেই আটটি সদ্‌গুণ হল : সত্র, যোগ, দয়া, শুদ্ধতা, দানশীলতা, ক্ষমা, তপশ্চর্যা এবং ব্রহ্মচর্য।

প্রশ্ন : ৮২৯ ॥ কুরুক্ষেত্রের কোন্ স্থানে এবং কোন দিনে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতার উপদেশ দিয়ে ছিলেন?

উত্তর : কুরুক্ষেত্রের **জ্যোতিসর** নামক স্থানে মোক্ষদা একাদশীর দিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতার উপদেশ প্রদান করেছিলেন। এখন প্রতি বছরই এই দিনটিকে ভগবৎগীতার জন্মদিনরূপে বিবেচিত হয়।

প্রশ্ন : ৮৩০ ॥ কুরুক্ষেত্রের কোন্ স্থানে ভীষ্মদেব শরশর্য্যায় শায়িত ছিলেন?

উত্তর : কুরুক্ষেত্র থেকে ৩ মাইল দুরে বর্তমানের বাণগঙ্গা বা ভীষ্মকুণ্ড নামে পরিচিত এক স্থানে কুরু-পাণ্ডবদের পিতাসহ ভীষ্মদেব শরশর্য্যায় শায়িত ছিলেন। এক মতে তিনি ৪০ দিন এবং অন্য মতে ৫৮ দিন এই অবস্থায় ছিলেন এবং এক সময় সূর্যের উত্তরায়ন আরম্ভ হলে দেহ ত্যাগ করেন।

প্রশ্ন : ৮৩১ ॥ অনেকে বলেন যে শ্রীল গৌর কিশোর দাস বাবাজী মহারাজের একমাত্র শিষ্য হলেন শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ। আসলে কি তাই?

উত্তর : একথা সত্য যে শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ছিলেন শ্রীল গৌর কিশোরদাস বাবাজী মহারাজের প্রিয়তম এবং সর্বোত্তম শিষ্য, তবে একমাত্র শিষ্য নন। তিঁনি ছাড়াও কিছু শিষ্য শ্রীল গৌর কিশোর দাস বাবাজী মহারাজের ছিল। যেমন আগরতলা নিবাসী শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র কুমার সেন, উকিল শ্রী অশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য প্রমুখ ছিলেন অন্যতম প্রধান শিষ্য।

প্রশ্ন : ৮৩২ ॥ একজন গৌসাইকে দেখেছি শিষ্যদেরকে তুই, তুমি ইত্যাদি বলে সম্বোধন করছেন। এরূপ করা কোন গুরুদেবের জন্য সঠিক?

উত্তর : আমার নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি গৌড়ীয় মঠের শ্রীল ভক্তি প্রসাদ মধুসুদন মহারাজ তাঁর শিষ্যদেরকে আপনি বলে সম্বোধন করেন। শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদও তাই করতেন। শ্রীল গৌর কিশোর দাস বাবাজী মহারাজ তাঁর এক শিষ্য শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র কুমার সেনকে এক পত্রে কি লিখেছিলেন তা শুনুন :

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবক আপনারা। আপনাদের সেবক আমি। আমার নাম আপনারা রাখিয়াছেন শ্রী গৌর কিশোর দাস। আপনাদের রাখা নামে যেন কোন কলঙ্ক হয় না। যদি কলঙ্ক হয় তবে শ্রী গৌর মণ্ডল ও শ্রীব্রজ মণ্ডলে বড়ই লজ্জা পাইবেন।" (সূত্র : শ্রীল হরিদাস দাস, শ্রী শ্রী গৌড়ীয়-বৈষ্ণব জীবন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮)

প্রশ্ন : ৮৩৩ ॥ আজকাল দেখা যায় গুরু নামধারী এক শ্রেণীর গোসাই নির্বিচারে শিষ্য করে যাচ্ছেন। এ সম্পর্কে শাস্ত্রীয় এবং বৈষ্ণব মহাজনদের কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম আছে কি?

উত্তর : শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ তাঁর **ভক্তিরসামৃত সিন্ধু** বইতে (১/২/১১৩) বলেছেন : **"ন শিষ্যাননুবধ্নীত"**—অর্থাৎ বহু শিষ্য করিবে না। শ্রীল কৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামীর শিষ্য শ্রীল মুকুন্দদাস গোস্বামী ভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থের "অর্থ রসাত্মক দিপীকা" নামক একটি টীকা রচনা করেন। এতে তিনি লিখেছেন : "নানুবধ্নীয়াৎ নানুসরেৎ তছনাসরনে লাভ-পুজা-প্রতিষ্ঠাদিনা সাধকস্য সাধন-শৈথিল্য-প্রাপ্তে, শিষ্যকরনং তু জাতরতী নামের বিহিতত্বাচ্চ।"—অর্থাৎ শিষ্য করণের লোভে পরীক্ষা না করিয়াই বহু শিষ্য করিবে না। এরূপ করিলে লাভ-পুজা-প্রতিষ্ঠা লালসা প্রবল হইবে। তাহাতে সাধকের ভক্তি সাধনের প্রতি শিথিলতা আসিবে। এজন্য যাঁহারা জাতরতি—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ চরণে রতি লাভ করিয়াছেন তাঁহারাই শিষ্যকরণের অধিকারী।

শ্রী শ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান গ্রন্থের রচয়িতা মহান বৈষ্ণব শ্রী হরিদাস দাস বলেছেন : "যাঁহারা গুরু সাজিয়া অযোগ্য শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের ভজন শৈথিল্য এবং শিষ্যগণের ব্যবহারে মনস্তাপ লাভ বার বার লক্ষ্য করিয়াছি।" এজন্য তিনি জীবনে কোন শিষ্যই গ্রহণ করেন নাই।

প্রশ্ন : ৮৩৪ ॥ শ্রীমন্ মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যান প্রসঙ্গে বলেছেন—

হরিদাস আছিল পৃথিবীর শিরোমণি।
তাঁহা বিনা রত্নশুন্যা হইলা মেদিনী ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে পৃথিবীর শিরোমণি কেন বললেন?

উত্তর : এর উত্তর শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের পরবর্তী উক্তিতেই সংক্ষেপে রয়েছে।

লোক নিস্তারিতে এই তোমার অবতার।
নামের মহিমা লোকে করিলা প্রচার।

এর মমার্থ হল এই যে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তগণ তাঁরই কৃপা-মূর্ত্তি। ভগবানের ইচ্ছায় তাঁরা মায়ায় কবলিত জীবদের নিস্তার হেতু এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। এঁরাই অপ্রাকৃত রত্ন এবং পৃথিবীর শিরোমনি। এই জগতে যারা অন্নদাতা, ধনদাতা তারা জীবের জড়দেহ ও মনের কিছুটা আনন্দ দিতে পারে মাত্র। কিন্তু মায়াবদ্ধ জীবের অজ্ঞান অন্ধকার দুর করে ভগবৎ সাক্ষাৎকারের বিমল-আনন্দ একমাত্র ভগবৎ ভক্তই দিতে পারেন। তিন লক্ষ হরিনাম প্রতিদিন জপ করে শ্রীল হরিদাস ঠাকুর হয়েছিলেন এক ভূ-রত্ন। কাজেই তাঁর অপ্রকট হওয়ার পর জগৎ রত্নশুন্য হওয়ারই কথা।

প্রশ্ন : ৮৩৫ ॥ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নাম কে নিমাই রেখেছিলেন?

উত্তর : শ্রী অদ্বৈত প্রভুর স্ত্রী সীতাদেবী শ্রী জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে শিশুকে দেখতে এসে দেখলেন গোকুলের কৃষ্ণের সাথে এই শিশুর

কেবল গায়ের বর্ন ছাড়া আর কোন পার্থক্য নেই। শ্রী শচীদেবীর একে একে প্রথম আটটি সন্তান অপ্রকট হন। এই কারণে সীতাদেবী স্নেহবশত শাকিনী-ডাকিনীর তিতাসূচক নাম রাখেন—নিমাই।

প্রশ্ন : ৮৩৬ ॥ সাধনা বা ভক্তি অঙ্গ অনেক থাকলেও সবচেয়ে প্রধান কয়টি অঙ্গ আছে এবং সেগুলো কি কি?

উত্তর : বহু ভক্তি অঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল পাঁচটি অঙ্গ। সেগুলো হচ্ছে—

১. সাধুসঙ্গ, ২. হরিনাম কীর্তন, ৩. ভাগবত শ্রবণ, ৪. ধাম-বাস এবং ৫. শ্রী বিগ্রহ সেবা।

প্রশ্ন : ৮৩৭ ॥ শ্রী নবদ্বীপ এবং শ্রীবৃন্দাবন ধামের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে?

উত্তর : প্রকৃত পক্ষে কোন পার্থক্য নেই। শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর তাঁর **নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গে** বলেছেন—

সর্ব অবতারের সকল ভক্ত লইয়া।
বৃন্দাবনচন্দ্র গৌর বিহরে নদীয়া ॥
নবদ্বীপ-বৃন্দাবন দুই এক হয়।
গৌর-শ্যামরূপে প্রভু সদা বিলসয় ॥

প্রশ্ন : ৮৩৮ ॥ শ্রী নবদ্বীপ ধাম যে নয়টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত সেগুলোর নাম কি কি?

উত্তর : ষোল ক্রোশ (এক ক্রোশ = ২ মাইল) বিশিষ্ট শ্রী নবদ্বীপ ধামের নয়টি দ্বীপের নাম হলো—

১. অর্ন্তদ্বীপ (শ্রী মায়াপুর)।
২. সীমন্ত দ্বীপ (সিমুলিয়া)।
৩. গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা)।
৪. মধ্যদ্বীপ (মাজদিয়া)।
৫. কোলদ্বীপ (বর্তমান নবদ্বীপ শহর)।
৬. ঋতুদ্বীপ (রাতুপুর)।

৭. মোদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি)।

৮. জহ্নু দ্বীপ (জ্নাগর)।

৯. রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া)।

প্রশ্ন : ৮৩৯ ॥ ব্রাহ্মণকুলে জন্ম নেয়া সত্ত্বেও শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু এবং শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু হিন্দু সমাজ থেকে চ্যুত হয়েছিলেন কেন?

উত্তর : তৎকালীন হিন্দু সমাজ অত্যন্ত গোড়া ছিল। সমাজপতি এবং ব্রাহ্মণরা ছিলেন অত্যন্ত রক্ষনশীল মনোভাবাপন্ন। নানান ধরনের কুসংস্কার দ্বারা সমাজ ছিল পরিচালিত। ঐ সময়ে কোন হিন্দু, সে ব্রাহ্মণ বা যেকোন বর্ণের হোক না কেন, মুসলমান বাদশা বা রাজার অধীনে কোন চাকরি নিলে তাকে সমাজচ্যুত করা হতো। তাই সারস্বত ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও তৎকালীন মুসলমান নবাব হুসেন শাহের দরবারে চাকরি নেওয়ায় শ্রীল সনাতন গোস্বামী এবং শ্রীল রূপ গোস্বামী সমাজচ্যুত হয়েছিলেন।

প্রশ্ন : ৮৪০ ॥ আমাদের এলাকার কিছু লোকজন বলেন,

গুরু রেখে গৌরাঙ্গ ভজে

সেই পাপী নরকে মজে ॥—একথা কি সত্যি?

উত্তর : এই কথাগুলো খুব সম্ভব তথাকথিত গুরু তার শিষ্যদের মাঝে প্রচার করেছেন। আসলে শ্রীগৌরাঙ্গ হলেন সমষ্টি গুরু। আর আমরা যে সব সৎগুরু দেখি তাঁরা হলেন ব্যষ্টি গুরু। তাঁরা সমষ্টি গুরু দ্বারা শক্তি সঞ্চারিত। অর্থাৎ সেবক ভগবান। তাই শ্রীগৌরাঙ্গকে সেবা না করে শুধুমাত্র গুরুদেবকে সেবা করা যেমন সম্পূর্ণ নয়, তেমনি সৎ গুরুকে পাশ কাটিয়ে সরাসরি গৌরাঙ্গদেবকে সেবা করতে যাওয়াও সঠিক নয়। উভয়ই পরিপূরক, বিকল্প নন।

প্রশ্ন : ৮৪১ ॥ শহরে থাকি। বাড়িতে এমন জায়গাও নেই যে গরু প্রতিপালন করে ভগবানের সন্তুষ্টির জন্য গো-সেবা করতে পারি। এই অবস্থায় করণীয় কি?

উত্তর : গরু সরাসরি প্রতিপালন না করেও বিনা খরচে নিম্নোক্তভাবে গো-সেবা করে ভগবানের প্রীতি সাধন করা সম্ভব—

আপনার বাড়ির প্রতিদিনের রান্নার সময় চাল-ডাল ধোয়া জল, ভাতের মাড়, বিভিন্ন ধরনের শাকসবজী কাটার পর অবশিষ্ট অংশ, (ছিলকা, খোসা ইত্যাদি) ফেলে না দিয়ে একটি পাত্রে জড় করে রাস্তার গরুকে খেতে দিন।

আবার বাড়ির কাছাকাছি যদি কারও গোসালা থাকে সেখানে গিয়ে এসব দ্রব্য দিতে পারেন। এক্ষেত্রে কিছু গো-খাদ্যও এসব দ্রব্যের সাথে মিশিয়ে দিতে পারেন।

আপনি যদি কোন শহরের এমন স্থানে থাকেন যেখানে রাস্তায় বা বাড়ির আশেপাশে গরু ঘুরে বেড়ায় তাহলে বাড়ির সামনে দুটি পাত্র রাখতে পারেন। একটি পাত্রে তরিতরকারী—শাকসবজীর খোসা, ভাতের মাড় ইত্যাদি রেখে দেবেন। অন্যপাত্রে কিছু জল রেখে দেবেন। দেখবেন এক সময় ঘুরে বেড়ানো গরুগুলো ঐসব খেয়ে যাবে। এভাবে কতকটা বিনা খরচে আপনি গো-সেবা করতে পারবেন।

প্রশ্ন : ৮৪২ ॥ এই জড়জগতে থেকেও কারা কৃষ্ণভজনে আগ্রহী হয় না?

উত্তর : শ্রী গর্গমুলি তাঁর গর্গসংহিতায় (১০/৬২/১২) বলেছেন নিম্নোক্ত ছয় ধরনের ব্যক্তিগণ কৃষ্ণভজনে আগ্রহী হয় না।

১. যারা জড় বিদ্যার ফলে গর্বিত অবস্থায় থাকে।
২. যারা প্রচুর ধনরত্ন থাকার ফলে কাউকেই পরোয়া করে না—অর্থাৎ ধন-গর্বিত।
৩. যারা নানা ধরনের জড়জাগতিক ভোগে লিপ্ত আছে।
৪. যারা নিজেদের উচ্চকুলের জন্য গর্বিত।
৫. যারা নিজের দৈহিক রূপ, সুন্দরী স্ত্রী ও পুত্র স্নেহে সবসময় ব্যস্ত।
৬. যারা জড়জাগতিক সুখের আশায় বিভিন্ন দেবদেবীকে দর্শন ও পুজার্চ্চনা করে।

উপরোক্ত ধরনের ব্যক্তিগণ জীবিত থেকেও মৃত। তারাই কৃষ্ণভজনে আগ্রহী হয় না।

প্রশ্ন : ৮৪৩ ॥ শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং শ্রীল সনাতন গোস্বামীর পূর্বাশ্রমে কি নাম ছিল এবং শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সাথে তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎ কোথায় হয়েছিল?

উত্তর : পূর্বাশ্রমে তাঁরা বাংলার নবাব হোসেন শাহের অধীনে চাকরি করতেন। সেই সময় শ্রীল রূপ গোস্বামীর নাম ছিল দবির খাস এবং শ্রীল সনাতন গোস্বামীর নাম ছিল সাকর মল্লিক। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সাথে দবির খাস ও সাকর মল্লিক—এই দুই ভাইয়ের প্রথম সাক্ষাৎ হয় ভারতের মালদহ জেলার রামকেলি গ্রামে।

প্রশ্ন : ৮৪৪ ॥ রূপানুগ কথাটির অর্থ কি এবং ইসকনের বৈষ্ণবরা নিজেদেরকে কেন রূপানুগ বৈষ্ণব বলেন?

উত্তর : রূপানুগ কথাটির অর্থ হল শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুপাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। অর্থাৎ তাঁর বৈষ্ণবীয় দর্শন অনুযায়ী সব কিছুর আচরণ করা। শ্রীরূপ গোস্বামীকে শ্রীমন্ মহাপ্রভু এক সময় ভারতের প্রয়াগের (এলাহাবাদে) দশাশ্বমেধ ঘাটে ১০ দিন ধরে পারমার্থিক তত্ত্ব সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেন। পরবর্তীকালে শ্রীল রূপ গোস্বামী সেই বিভিন্ন বৈদিক শাস্ত্রের বিবরণ শাস্ত্রজ্ঞানের মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। তিনি সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র পর্যালোচনা করে দেখিয়ে দেন যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পথ অনুসরণ করাই হল মানব জীবনের সর্বোত্তম উদ্দেশ্য। এই কারণে ইসকন ভক্তরা শ্রীল রূপ গোস্বামীর দর্শনের অনুসারী এবং সেই হেতু তাদেরকে রূপানুগ বৈষ্ণবও বলা হয়।

প্রশ্ন : ৮৪৫ ॥ ভক্তি এবং ভক্তিরস কথাটির অর্থ বুঝিয়ে বলুন।

উত্তর : ভক্তি কথাটির অর্থ হল ভগবানের সেবা করা। আর রস বলতে একধরনের প্রীতির সম্পর্ক বুঝায় যার স্বাদ অত্যন্ত মধুর। ভক্তিরস হল একধরনের অপ্রাকৃত রস যা কেবলমাত্র ভগবানের ভক্তরাই আস্বাদন করতে পারে। জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ জীব যে রস আস্বাদন করে সেই রস আর এই রস একরকম নয়। দিনরাত পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে পরিবার, আত্মীয় স্বজন এবং অপরাপর মানুষের সেবায় যে রস আস্বাদন করে তাহল এক ধরনের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি

ছাড়া আর কিছুই নয়। এই রসের স্বাদ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কারণ মৃত্যুর সাথে সাথেই তার অবলুপ্তি হয়।

তাই জড় ইন্দ্রিয় সুখ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এজন্য একে বলা হয় চপল সুখ। ভক্তিরস কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায় না। কারণ এই রস আত্মার সাথে নিত্যকাল বিরাজমান থাকে। এজন্য একে অমৃত বলা হয়—এর কখনো বিনাশ হয় না। ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে এই ভক্তিরসের পথে সামান্য অগ্রসর হতে পারলেও মনুষ্য জীবনের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয় থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। কারণ কৃষ্ণ ভাবনাময় কোন ভক্ত যদি এই জন্মে ভক্তিরসে পূর্ণ সিদ্ধি লাভ নাও করতে পারেন তাহলেও পরবর্তী জীবনে তিনি উচ্চ মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করে পূর্ণ কৃষ্ণ ভাবনামৃত অর্জনের সুযোগ লাভ করবেন।

প্রশ্ন : ৮৪৬ ॥ শুদ্ধ ভক্তির কি কি লক্ষণ আছে?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভাগবত (৩/২৯/১২-১৩) থেকে দেখা যায় ভগবান শ্রীকপিলদেব তাঁর মা দেবাহুতিকে ভগবৎ তত্ত্ব সম্পর্কে নির্দেশ দেয়ার সময় শুদ্ধ ভগবদ্‌ভক্তির লক্ষণ সম্পর্কে বলেছেন : "যাঁরা আমার শুদ্ধ ভক্ত, যাঁদের জড় জাগতিক কোন লাভের বাসনা অথবা মনোধর্ম প্রসূত জ্ঞানের প্রতি কোন আসক্তি নেই তাঁদের মন সবসময়ই আমার সেবায় এত গভীরভাবে মগ্ন থাকে যে তাঁরা আমার নিকট থেকে অহৈতুকী ভক্তি ছাড়া আর কিছুই প্রত্যাশা করেন না। এমনকি তাঁরা আমার ধামেও আমার সাথে বাস করার সৌভাগ্য পর্যন্ত কামনা করেন না।"

শ্রীল রূপ গোস্বামী বিভিন্ন শাস্ত্রীয় প্রমাণের মাধ্যমে শুদ্ধ ভক্তির ছয়টি লক্ষণ তাঁর **ভক্তিরসামৃত সিন্ধু** পুস্তকে বর্ণনা করেছেন—

১. শুদ্ধ ভক্তি ক্লেশঘ্নী—অর্থাৎ সবধরনের প্রাকৃতিক ক্লেশ তাৎক্ষণিকভাবে নিবৃত্তি করে।
২. শুদ্ধ ভক্তি শুভদা—অর্থাৎ সর্বদিক থেকেই মঙ্গলময়।
৩. শুদ্ধ ভক্তি সান্দ্রানন্দ বিশেষাত্মা—অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্তি দিব্য আনন্দ দেয়।
৪. শুদ্ধ ভক্তি সুদুর্লভা—অর্থাৎ এরূপ ভক্তি লাভ করা অত্যন্ত দুর্লভ বা কঠিন।

৫. শুদ্ধ ভক্তি মোক্ষল ঘুতাকৃৎ—অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্তি মোক্ষ বা মুক্তিকেও তুচ্ছ করে দেয়।

৬. শুদ্ধ ভক্তি কৃষ্ণাকর্ষণী—অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্তি শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করার একমাত্র উপায়।

শুদ্ধ ভক্তি হলেন শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ শক্তি। শ্রীকৃষ্ণ সবকিছুকেই আকর্ষণ করেন। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তি তাঁকেও আকর্ষণ কর।

প্রশ্ন : ৮৪৭ ॥ এই জড়জগতে আমাদের বিভিন্ন ক্লেশের মূল কারণ কি?

উত্তর : শ্রীল রূপগোস্বামী তাঁর **ভক্তিরসামৃত সিন্ধু** বইতে উল্লেখ করেছেন যে এই জন্মের পাপ এবং পূর্বজন্মের পাপ—এই দুই হল ক্লেশের মূল কারণ। পাপের ফল মূলত দুই ধরনের হয়—প্রারব্ধ এবং অপ্রারব্ধ। যে পাপকর্মের ফল আমরা বর্তমানে ভোগ করি তা হল প্রারব্ধ। যে পাপকর্মের ফল এখনও আরম্ভ হয় নাই সেই সঞ্চিত পাপকর্মকে অপ্রারব্ধ বলা হয়। যেমন কোন খারাপ ব্যক্তি অনেক অপরাধ বা পাপকর্ম করার ফলে এখনও ধরা পড়ে নাই। কিন্তু যখন সে ধরা পড়বে তখনই তাকে তার অপরাধের জন্য শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। এই ভাবে অপ্রারব্ধ পাপকর্মের ফল মানুষকে ভবিষ্যতে ভোগ করতে হয়। আর প্রারব্ধ পাপকর্মের ফল মানুষকে বর্তমানকালেই ভোগ করতে হয়। মারাত্মক দৈহিক রোগ, জেল-জরিমানা, নীচকুলে জন্ম, বিদ্যার অভাব, কুৎসিত হয়ে জন্মগ্রহণ ইত্যাদি হল প্রারব্ধ পাপকর্মের ফলাফল।

প্রশ্ন : ৮৪৮ ॥ আমরা যে পাপকর্ম করে চলেছি তার ফল কত ধরনের এবং কি কি হয়?

উত্তর : পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে পাপকর্মের ফল চার ধরনের হয় :

১. অপ্রারব্ধ।

২. কূট।

৩. বীজ।

৪. ফলোন্মুখ

যে পাপের ফল ভোগ হতে চলেছে তাকে বলা হয় ফলোন্মুখ। হৃদয়ে বীজ রূপে যে যে পাপের ফল রয়েছে তাকে বলা হয় বীজ। বীজের উন্মুখতার কারণকে বলা হয় কূট। আর যে পাপের ফল এখনও প্রকাশিত হয় নাই তাকে বলা হয় অপ্রারব্ধ। তপস্যা, দান, ব্রত ইত্যাদির ফলে পাপের নাশ হয় কিন্তু হৃদয়ের পাপ বীজের নাশ হয় না। ভগবৎ ভক্তির পথ অনুসরণ না করলে সমস্ত পাপ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়া যায় না।

প্রশ্ন : ৮৪৯ ॥ কৃষ্ণ ভাবনাকে সর্ব মঙ্গলময় বলা হয় কেন?

উত্তর : যথার্থ মঙ্গল সর্বজগতের কল্যাণ সাধন করে। আজকাল বেশিরভাগ মানুষকেই ব্যক্তি এবং পরিবারের কল্যাণ সাধনের জন্য তৎপর হতে দেখা যায়। আবার কিছু মানুষকে সমাজ, জাতি এবং রাষ্ট্রীয় কল্যাণের জন্যও সচেষ্ট হতে দেখা যায়। কিন্তু এরূপ প্রচেষ্টা ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং জাতিগত স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হতে দেখা যায়। ফলস্বরূপ সর্ব মঙ্গলজনক হয় না। এজন্য **পদ্মপুরাণে** বলা হয়েছে, যে মানুষ সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত হয়ে ভগবৎ ভক্তি সাধনে নিয়োজিত তিনি সমস্ত জগতের কল্যাণ করতে সমর্থ হন। কারণ তিনি শুধু মানব সমাজের নয়, গাছপালা, পশু-পাখিদেরও কল্যাণ সাধন করেন। ফলে তারাও ভগবানের কৃপা লাভ করতে সমর্থ হয়।

প্রশ্ন : ৮৫০ ॥ কৃষ্ণভাবনামৃতের আনন্দ চিরস্থায়ী কেন?

উত্তর : শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর **ভক্তিরসামৃত সিন্ধু** বইতে আনন্দকে তিনভাগে ভাগ করেছেন—

১. জড়বস্তু থেকে প্রাপ্ত সুখভোগের আনন্দ।

২. ব্রহ্মানন্দ—অর্থাৎ পরব্রহ্মের সাথে নিজেকে এক বলে মনে করার আনন্দ।

৩. কৃষ্ণ ভাবনামৃতের আনন্দ।

জড় সুখভোগের আনন্দ অনিত্য। কারণ মৃত্যুর সাথে সাথেই এই আনন্দ শেষ হয়ে যায়। আবার পরব্রহ্মের সাথে লীন বা মিশে যাওয়ার আনন্দ অত্যন্ত নিকৃষ্ট। কারণ এরূপ সুখও চিরন্তন নয় এবং যে কোন

সময় এরূপ সুখ থেকে পতনের সম্ভাবনা আছে। পক্ষান্তরে শুদ্ধ ভক্তির আনন্দ হল সর্বোত্তম। কারণ এই আনন্দ নিত্য এবং শ্বাশত। তন্ত্রশাস্ত্র থেকে দেখা যায় শ্রী শিব তাঁর স্ত্রী পার্বতীকে বলেছেন, যিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণাগত হয়ে শুদ্ধ ভগবৎ ভক্তির লাভ এবং বিকাশ করেছেন তিনি নির্বিশেষবাদীদের প্রার্থিত সব সিদ্ধি অনায়াসে লাভ করতে পারেন এবং এর উর্ধ্বেও শুদ্ধ ভক্তির পরম আনন্দ তিনি আস্বাদন করতে পারেন।

প্রশ্ন : ৮৫১ ॥ কৃষ্ণভক্তি বা শুদ্ধ ভক্তি সুদুলর্ভ কেন?

উত্তর : পারমার্থিক জীবনের প্রথম স্তরে কোন লোক আত্ম উপলব্ধির জন্য তপঃ, ত্যাগ ইত্যাদি ধরনের কৃচ্ছতা সাধন করতে পারে।

কিন্তু এইসব উপায়ে সাধক যদি জড়জগতের কামনা-বাসনা থেকেও রহিত হন তবুও তারা শুদ্ধ ভগবৎ ভক্তি লাভ করতে পারেন না। কারণ স্বাধীনভাবে ভক্তিযোগে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আশাপ্রদ নয়। কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাকে-তাকে ভক্তি প্রদান করতে চান না। শুদ্ধ ভক্তি কেবলমাত্র পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক্তের কৃপায় লাভ হতে পারে। **শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে** (মধ্য ১৯/১৫১) বলা হয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্ত শ্রী গুরুদেব ও শ্রীকৃষ্ণের কৃপার ফলেই কেবলমাত্র ভক্তিপথে অধিষ্ঠিত হওয়া যায়।

শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রহ্লাদ মহারাজের কথা থেকেও দেখা যায় ব্যক্তিগত চেষ্টা অথবা কোন মহাপুরুষের উপদেশ শ্রবণ করেও যার-তার পক্ষে ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হওয়া সম্ভব নয়। জড় কামনা-বাসনা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ভগবানের কোন শুদ্ধ ভক্তের পদরজের দ্বারা অভিষিক্ত না হলে কৃষ্ণভক্তি লাভ করা যায় না।

আসলে ভগবান সহজেই মুক্তিদান করেন, কিন্তু তিনি সহজে ভক্তিদান করতে চান না। কারণ ভক্তির প্রভাবে তিঁনি নিজেই ভক্তের কাছে বিক্রিত হয়ে যান।

প্রশ্ন : ৮৫২ ॥ শুদ্ধ ভক্ত যে কোন ধরনের মুক্তিকে কেন তুচ্ছ মনে করেন?

উত্তর : মুক্তি পাঁচ ধরনের রয়েছে।

১. সাজুয্য : অর্থাৎ ভগবানের সাথে লীন বা মিশে যাওয়া।

২. সালোক্য : অর্থাৎ ভগবৎ লোকে বসবাস করা।

৩. সারূপ্য : অর্থাৎ ভগবানের রূপ প্রাপ্ত হওয়া।

৪. সামীপ্য : অর্থাৎ ভগবানের সান্নিধ্যে বসবাস করা।

৫. সাষ্টি : অর্থাৎ ভগবানের সমান ঐশ্বর্য্য লাভ করা।

শুদ্ধ ভক্ত উপরের কোন ধরনের মুক্তিই কামনা করেন না। তিঁনি প্রীতির সাথে ভগবানের সেবা করেই পুরাপুরি তৃপ্তি লাভ করেন।

শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ বলেছেন যে সাযুজ্য মুক্তি—অর্থাৎ ব্রহ্মেলীন হয়ে যাওয়ার আনন্দকে যদি কোটী কোটী গুণ বাড়ানোও হয়, তবুও ভগবৎ ভক্তির আনন্দ সমুদ্রের এক বিন্দুর সাথেও তার তুলনা হতে পারে না।

প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন, "হে জগদীশ্বর ভগবান, আপনার সান্নিধ্যে থেকে আমি দিব্য আনন্দ অনুভব করছি, যেন আমি আনন্দের সমুদ্রে অবগাহন করছি। এই আনন্দের কাছে ব্রহ্মাণন্দকে গোষ্পদের তুল্য মনে হচ্ছে।"

শ্রীল শ্রীধর স্বামীপাদ তাঁর ভাবার্থদিকীকায় বলেছেন যে, "হে ভগবান, যে সব মহাভাগ্যবানরা তোমার ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে সাতার কাটছেন, এবং সবসময় তোমার লীলামৃত আস্বাদন করছেন, তাঁরা জানেন যে ই পরম আনন্দের সাথে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ থেকে প্রাপ্ত সুখের কোন তুলনাই হয় না।" এই ধরনের শুদ্ধ ভক্ত ভগবৎ প্রেমের আনন্দ ছাড়া অন্য সব আনন্দকে তিলের মত মনে করেন।

প্রশ্ন : ৮৫৩ ॥ অনেকেই বলেন যে পূর্বজীবনের সুকৃতি না থাকলে এই জীবনে ভগবৎ ভক্তি লাভ হয় না। একথা কি সত্যি?

উত্তর : শ্রীল রূপগোস্বামী তাঁর **ভক্তিরসামৃত সিন্ধু** বইতে বলেছেন যে ভগবৎ ভক্তি অনুশীলনে রত লোকেরা তাঁদের ব্যক্তিগত রুচি

অনুযায়ী ভগবৎ ভক্তির বিভিন্ন স্তরে অধিষ্ঠিত হন। তিনি বলেছেন যে ভক্তির সাধন পূর্ব জন্মের সাধনার অনুক্রমে চলতে থাকে। সাধারণত আগের জন্মে যোগাযোগ না থাকলে ভগবৎ ভক্তি সাধনে ব্রতী হওয়া যায় না। যেমন কেউ যদি এই জীবনে ভগবৎ ভক্তির অনুশীলন করেন তবে তার সাধনা পূর্ণ না হলেও যতটা তিনি অনুশীলন করেছেন, তা ব্যর্থ হবে না। পরবর্তী জীবনে যখন তিনি ভক্তির অনুশীলন আরম্ভ করবেন তখন আগের জীবনে যে স্তরে শেষ করেছিলেন সেখান থেকেই আরম্ভ করবেন। এইভাবে ভক্তির সাধন অনবরত চলতে থাকে। কিন্তু কারও যদি এই ধরনের পূর্বের সাধনা না থাকে এবং হঠাৎ কোন শুদ্ধ ভক্তের উপদেশে রুচি হওয়ার ফলে ভক্তিপথ অঙ্গীকার করেন তবে তিনিও এই পথে উন্নতি সাধন করতে পারেন।

প্রশ্ন : ৮৫৪ ॥ ব্রাহ্মণকে ভোজন করালেই নাকি ভগবানকে ভোজন করানো হয়? সত্যি কি তাই?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভাগবতে বলা হয়েছে যে ভগবানের মস্তক থেকে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হয়েছেন। তাই এই ব্রাহ্মণের কর্তব্য হল দিব্য বৈদিক মন্ত্র বা বানীর প্রচার করা। ব্রাহ্মণ যেহেতু ভগবানের মুখ তাই তাঁর কর্তব্য হল শব্দ ব্রহ্মের (যেমন বেদ, শ্রীমদ ভাগবত ইত্যাদি) প্রচার করা এবং ভগবানের হয়ে ভোজন করা। বৈদিক বিধান হচ্ছে ব্রাহ্মণ যখন ভোজন করেন তখন তাঁর মাধ্যমে ভগবান ভোজন করছেন বলে মনে করা উচিত। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে ব্রাহ্মণ ভগবানের হয়ে ভোজন করার নাম করে সবসময়ই কেবলমাত্র ভোজন করতে থাকবেন এবং ভগবানের বাণী প্রচার না করলেও তার চলবে। আসলে শ্রী ভগবানের বাণী যিনি প্রচার করেন তিনি ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় হন। এই সত্য শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতাতেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রতিপন্ন করেছেন। তাই ভগবানের মহিমা, যশ, তাঁর দিব্য জন্ম ও কর্ম যিনি প্রচার করেন তিনিই হলেন যথার্থ ব্রাহ্মণ। এই ধরনের ভক্তরূপী ব্রাহ্মণকে ভোজন করানোর মাধ্যমেই কেবলমাত্র সরাসরি ভগবানকে ভোজন করানো যায়।

প্রশ্ন : ৮৫৫ ॥ ভগবদ্ ভক্ত পাঁচ ধরনের মধ্যে কোন মুক্তিই কামনা করেন না। তাহলে কি এগুলো ভগবৎ ভক্তির প্রতিকূল?

উত্তর : মুক্তি পাঁচ ধরনের : সাযুজ্য, সালোক্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি এবং সামীপ্য। এই পাঁচ ধরনের মুক্তির মধ্যে ভগবৎ ভক্ত কখনই সাযুজ্য মুক্তি গ্রহণ করেন না। অন্য চার ধরনের মুক্তিও ভক্তরা কামনা করেন না। কিন্তু সেগুলো ভগবৎ ভক্তির প্রতিকূল নয়। এই চার ধরনের মুক্তিপ্রাপ্ত মুক্ত লোকেরাও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত হয়ে অপ্রাকৃত জগৎ গোলোক বৃন্দাবনে উন্নীত হতে পারেন। অর্থাৎ যাঁরা ইতিমধ্যে বৈকুণ্ঠে উন্নীত হয়েছেন এবং এই চার ধরনের মুক্তি লাভ করেছেন তাঁদের হৃদয়েও পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অনুরাগের উদয় হতে পারে এবং সেই হেতু তাঁরা গোলোক ধামে উন্নীত হতে পারেন।

প্রশ্ন : ৮৫৬ ॥ ভগবৎ ভক্তদের মধ্যে কাদেরকে সর্বোত্তম বলা যায়?

উত্তর : বিভিন্ন ধরনের ভগবৎ ভক্তের মধ্যে তিনিই সর্বোত্তম যিনি শ্রীধাম বৃন্দাবনে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপ এর প্রতি আকৃষ্ট। এরূপ ভক্তগণ কখনো বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্যের প্রতি আকৃষ্ট হন না। এমনকি শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী দ্বারকাধামের প্রতিও তাঁরা আকৃষ্ট হন না। শ্রীলরূপ গোস্বামী বলেন, যে সব ভক্ত পরমেশ্বর ভগবানের গোকুল বা শ্রীবৃন্দাবন লীলার প্রতি আসক্ত, তাঁরাই হলেন সর্বোত্তম ভক্ত।

ভগবানের অনন্তরূপ রয়েছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ রূপ হল তাঁর স্বয়ংরূপ। একথা ঠিক যে ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন রূপের সব ভক্তই সমপর্যায় ভুক্ত। তারপরও শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে কৃষ্ণ ভক্তই হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ।

প্রশ্ন : ৮৫৭ ॥ ভগবৎ ভক্তির সাধন ও প্রচার নাকি কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণকারী গোস্বামীদেরই রয়েছে? একথা কি সত্য?

উত্তর : পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহান পার্ষদ শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর অপ্রকটের পর ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণকারী এক শ্রেণীর

মানুষ নিজেদেরকে নিত্যানন্দ বংশীয় গোস্বামী বলে পরিচয় দিতে আরম্ভ করেন। তারা দাবী করেন যে ভগবৎ ভক্তির সাধন ও প্রচারের অধিকার কেবলমাত্র তাদেরই রয়েছে। এইভাবে কিছু কাল ধরে এই জগতে তারা কৃত্রিম আধিপত্য চালাতে থাকে।

এই সময় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মহান বৈষ্ণব আচার্য শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাদের উপরোক্ত মতবাদ সম্পূর্ণ রূপে খণ্ডন এবং বিধ্বস্ত করেন। প্রথম দিকে তাঁকে এ ব্যাপারে কঠোর সংগ্রাম করতে হয় এবং অবশেষে তিনি সফল হন। এখন শাস্ত্রীয় বিচারে প্রমাণিত যে ভক্তির অধিকার কোন বিশেষ জাতির ও বর্ণের মধ্যে সীমিত নয়। তাছাড়া যিনি ভক্তি পথে অধিষ্ঠিত হয়েছেন তিনি ইতোমধ্যেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছেন বলা যায়।

প্রশ্ন : ৮৫৮ ॥ দীক্ষা গ্রহণ করলেই কি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা যায়?

উত্তর : স্কন্দ পুরানের কাশী খণ্ডে বলা হয়েছে ময়ূরধ্বজ নামক দেশে শূদ্রদের চেয়েও নীচ অন্ত্যজ কুলে জন্মগ্রহণকারী মানুষরাও দীক্ষা প্রাপ্ত হয়ে ভক্তি পথ অবলম্বন করেন এবং দ্বাদশ অঙ্গে তিলক ধারণ এবং কণ্ঠিমালায় ভূষিত হন। এইভাবে যখন বৈষ্ণব সাজে সজ্জিত হয়ে তাঁরা জপমালায় জপ করেন তখন মনে হয় তাঁরা বৈকুণ্ঠলোক থেকে এসেছেন। অর্থাৎ তখন তাঁদের দেখেই বোঝা যায় যে তাঁরা ইতিমধ্যেই স্বাভাবিকভাবে ব্রাহ্মণত্বের স্তর অতিক্রম করেছেন।

বৈষ্ণব স্বাভাবিকভাবেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী **শ্রীহরিভক্তি বিলাস** নামক বইতে উল্লেখ করেছেন যে কেউ যখন যথাযথভাবে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন তখন তিনি অবশ্যই ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত হন। যথাযথ পরম্পরা ধারায় সদ্ গুরুর তত্ত্বাবধানে যে কেউ বৈষ্ণব ধর্ম অবলম্বন করলে তিনি স্বাভাবিকভাবেই ব্রাহ্মণত্বের সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত হতে পারেন। তবে মনে রাখা দরকার যে কেবল দীক্ষা গ্রহণের ফলেই মানুষ উন্নত ব্রাহ্মণে পরিণত হয় না। ব্রাহ্মণোচিত

আচরণ করার ফলে এবং গভীর নিষ্ঠার সাথে শাস্ত্রের নির্দেশ পালন ও অনুশীলন করার মাধ্যমেই কেবলমাত্র যথার্থ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা সম্ভব।

প্রশ্ন : ৮৫৯ ॥ ভক্তিপথ থেকে কেউ সাময়িকভাবে বিচ্যুত হলে আবার এই পথে আসতে হলে তাকে কি কোন প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে?

উত্তর : শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর **ভক্তিরসামৃত সিন্ধু** বইতে বলেছেন যে কেউ যদি যথাযথভাবে ভগবৎ ভক্তির অনুশীলন করেন তাহলে তাঁর বিচ্যুত বা অধঃপতনের কোন প্রশ্নই উঠে না। তবে দৈবাৎ যদি কখনো অধঃপতন হয় তবে বৈষ্ণবকে তার জন্য কোন প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় না। ভক্তিপথ থেকে যদি কারও অধঃপতন হয় তবে ভুল সংশোধনের জন্য কোন প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না। কেবলমাত্র আবার ভগবৎ ভক্তির বিধিসমূহ যথাযথভাবে পালন করার ফলে তিনি ভক্তিপথে পুণরায় ফিরে আসতে পারেন। এই হল বৈষ্ণব ধর্মের মাহাত্ম্য।

প্রশ্ন : ৮৬০ ॥ চিন্ময় স্তরে চেতনা উন্নীত করার কয়টি পথ বা উপায় রয়েছে এবং তাদের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ?

উত্তর : চিন্ময় স্তরে চেতনাকে পৌছানোর জন্য তিনটি উপায় বা পন্থা আছে : কর্ম, জ্ঞান এবং ভক্তি। বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত। নিজের মনমত জল্পনা-কল্পনা জ্ঞান কাণ্ডের অন্তর্গত। ভক্তিমার্গ হল ভগবানের সেবার অন্তর্গত। এর সাথে কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ডের কোন সম্পর্ক নেই। ভক্তিমার্গে দার্শনিক জল্পনা-কল্পনা অথবা আচার অনুষ্ঠানের কোন সম্পর্ক বাধ্যবাধকতা নেই। শ্রীমদ্ ভাগবতে (১১/২১/২) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেছেন, "দোষ ও গুণের নির্ণয় এভাবে করা যায়—ভক্তিযোগী পুরুষ কখনো সকাম কর্ম অথবা মনোধর্মের আশ্রয় নেন না। আচার্য ও শাস্ত্রের বিধিবিধান অনুসরণ করে ভক্তিপথে নিষ্ঠাপরায়ন হওয়াই সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ।"

শ্রীমদ ভাগবতের নবম স্কন্দে ভগবান ঋষভদেব তাঁর পুত্রদের এইভাবে উপদেশ দিয়েছেন : "সকাম কর্মী জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনে আবদ্ধ

থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত না তার হৃদয়ে ভগবান বাসুদেবের প্রতি প্রেমভাবের উদয় না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সে এই বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না।"

শ্রীমদ্ ভাগবতে (১১/১১/৩২) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেছেন : "হে উদ্ধব! যে মানুষ অন্য সব কর্তব্য ত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে আমার শরনাগত হয় এবং আমার আজ্ঞা পালন করে সেই হল সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ।" পরমেশ্বর ভগবানের এই কথা থেকে বুঝা যায় যে সব মানুষ দাতব্য, নৈতিক, পরের উপকার সাধনে নিয়োজিত এবং সমাজের কল্যাণ সাধনে আসক্ত, জড়জাগতিক বিচারে তাদের খুব ভাল মানুষ বলে গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু শ্রীমদ্ ভাগবতসহ অপরাপর প্রামাণিক বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে যে মানুষ ভক্তিযোগে যুক্ত হয়ে কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত বিভিন্ন কর্মে নিয়োজিত আছেন তিনিই হলেন সর্বোত্তম।

প্রশ্ন : ৮৬১ ॥ বিজয় বিগ্রহ কি?

উত্তর : ভগবানের মন্দিরে মূল বিগ্রহ ছাড়াও একটি ছোট বিগ্রহ থাকে। একে বলা হয় বিজয় বিগ্রহ। সাধারণত কোন উৎসব উপলক্ষে এই বিজয় বিগ্রহকে শোভাযাত্রা সহকারে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। কোন কোন মন্দিরে প্রচলিত প্রথা হল প্রতিদিন সন্ধাবেলায় অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত সিংহাসনে অথবা পাল্‌কিতে করে ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে শোভাযাত্রা সহকারে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। শ্রীবিগ্রহের উপর সুন্দর ছত্র ধারণ করা হয় এবং এরূপ শোভাযাত্রায় নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়।

প্রশ্ন : ৮৬২ ॥ বুদ্ধদেবতো শ্রীকৃষ্ণের অবতার। তাহলে তিনি কেন নাস্তিক্যবাদ প্রচার করলেন?

উত্তর : কলিযুগে একসময় বেদের নামে অসংখ্য পশু হত্যার প্রচলন হয়। এই প্রথা বন্ধ করার জন্য তখন ভগবান বেদের নিন্দা করে অহিংসার বাণী প্রচার করেছিলেন। সেই সময় ব্রাহ্মণরা বেদবিহিত যজ্ঞের নাম করে বহু পশু হত্যার পাশাপাশি পশুর মাংস ভক্ষণ করছিল।

তাই এই সব অধঃপতিত মানুষদের বেদের নামে ঐরূপ পাশবিক আচরণ থেকে রক্ষা করার জন্য ভগবান বুদ্ধদেব রূপে অবতরণ করেছিলেন। এছাড়া নাস্তিকদের জন্য তিনি নাস্তিক্যবাদ প্রচার করেছিলেন যাতে তারা তাঁর অনুগামী হয় এবং তার ফলে পরোক্ষভাবে ভগবৎমুখী হয়। তাঁর শিক্ষা এজন্য নাস্তিকদের বিমোহিত করার জন্য, পরমার্থ সাধনে একান্তভাবে আগ্রহী মানুষদের জন্য নয়।

প্রশ্ন : ৮৬৩ ॥ গৌতমবুদ্ধ ভগবানেরই অবতার। আর তাই তাঁর অনুগামী—অর্থাৎ বৌদ্ধদেরকেও ভক্ত বলা বা গণ্য করা উচিত—তাই নয় কি?

উত্তর : শ্রীল রূপগোস্বামীপাদ বলেছেন যে বুদ্ধদেবের অনুগামীরা ভক্ত পর্যায়ভুক্ত নয়। বুদ্ধদেব অবশ্যই ভগবানের অবতার। কিন্তু তাঁর অনুগামীরা বৈদিক তত্ত্ব-দর্শন বিহীন হওয়ায় পরমার্থ সম্পর্কে অজ্ঞান। বৌদ্ধরা বেদের প্রামানিকত্ব স্বীকার করে না। অথচ বেদ ভগবানের বাণী। এসব কারণে বৌদ্ধদেরকে ভক্ত পর্যায়ভুক্ত বলা যায় না।

প্রশ্ন : ৮৬৪ ॥ ভগবানকে তো একটু ফল, ফুল, পাতা ও জল দিয়েই অর্চনা করা যায়। তবে আর আড়ম্বরভাবে পুজার দরকার কি?

উত্তর : একথা সত্য যে শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন যে ভক্ত যদি তাঁকে একটু ফল, ফুল, পাতা এবং জল দিয়েও পুজা করেন তাহলেও তিনি প্রীত হন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে খুব সুন্দরভাবে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করে ভগবানের পুজা করার যার সামর্থ্য রয়েছে তিনিও কেবল মাত্র একটু জল, ফল, ফুল ও পাতা দিয়ে ভগবানের সেবা পুজা করে তাঁর সন্তুষ্টি বিধান করবেন। সামর্থ্য থাকলে ফুল, অলঙ্কার এবং সুন্দর পোশাকে ভগবানকে সাজিয়ে মহাসমারোহে নানা রকম উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য তাঁকে নিবেদন করা উচিত। তা না হলে এরূপ ভক্তের বিত্তশাঠ্য অপরাধ হবে—অর্থাৎ অর্থ বা বিত্ত থাকা সত্ত্বেও শঠতা করে তা ভগবানের সেবায় ব্যয় না করলে বিত্তশাঠ্য অপরাধ হয়।

প্রশ্ন : ৮৬৫ ॥ গণেশের পুজা করে নাকি ভগবানের পুজা বা আরাধনা করা উচিত? এটি কি সঠিক?

উত্তর : গণেশ হলেন বিভিন্ন বিঘ্ন বিনাশকারী। তাই বিঘ্নবিনাশকারী গণগতির পুজা করে ভগবানের আরাধনা করা উচিত। **ব্রহ্মসংহিতায়** বলা হয়েছে যে গণপতি ভগবান শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করেন। তাই তাঁর পুজা করলে ভক্তিপথের সব বাধা বিঘ্ন দুর হয়। তাই ভক্তদের উচিত গণপতির পুজা করা।

প্রশ্ন : ৮৬৬ ॥ ভগবান ও তাঁর ভক্তের নিন্দা শুনলে কোন ভক্তের কিরূপ আচরণ করা উচিত?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভাগবতে (১০/৭৪/৪০) শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলেন, "হে রাজন! যদি কোন লোক ভগবান ও ভক্তের নিন্দা শুনে তৎক্ষণাৎ সেই স্থান ত্যাগ না করে তবে তার সমস্ত পুণ্য ক্ষয় হয়ে যায়।" ভক্ত নিজের সম্পর্কে নিরভিমান, সহিষ্ণু এবং বিনীত হতে পারেন। কিন্তু যখন ভগবান অথবা তাঁর ভক্তের কোন অপমান বা অবমাননা হয় তখন তার সহ্য করা উচিত নয়। এক্ষেত্রে তিন ধরনের প্রতিকার শাস্ত্র অনুযায়ী হতে পারে।

১. কেউ যদি কথার মাধ্যমে নিন্দা করে তবে ভক্তকে তা যুক্তিতর্ক দ্বারা খণ্ডন করতে হবে।
২. যদি তা না পারেন তবে দীনভাবে সেখানে দাড়িয়ে বিষ্ণু ও বৈষ্ণব নিন্দা শোনার চেয়ে বরং আত্মহত্যা করা ভাল।
৩. যদি তাও সম্ভব না হয় তবে সেই স্থান ত্যাগ করে চলে যাওয়া উচিত।

প্রশ্ন : ৮৬৭ ॥ মহামন্ত্র জপ এবং কীর্ত্তনের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

উত্তর : মৃদু স্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করাকে বলা হয় জপ। উচ্চঃস্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করাকে বলে কীর্তন। যেমন হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ

কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে,—এই মহামন্ত্র যখন কেবলমাত্র নিজে শোনার জন্য আস্তে আস্তে উচ্চারণ করা হয় তখন তাকে বলা হয় জপ। এই মন্ত্রই যখন সকলের শোনার জন্য উচ্চঃস্বরে উচ্চারণ করা হয় তখন তাকে বলা হয় কীর্তন।

মহামন্ত্র জপ ও কীর্তন দুইটিই করা যায়। তবে জপের ফলে কেবলমাত্র নিজের লাভ হয়। কিন্তু কীর্ত্তনের ফলে শ্রবণকারীসহ সবারই মঙ্গল হয়।

প্রশ্ন : ৮৬৮ ॥ শিক্ষিত কিছু লোক বলেন যে বর্ণাশ্রম ধর্মের অনুশীলন করলেও ধীরে ধীরে ভগবৎ ভক্তির সিদ্ধ অবস্থায় পৌছা যায়। একথা কি সঠিক?

উত্তর : জড় জগতের শিক্ষায় কিছু পণ্ডিত ব্যক্তি তর্ক করেন যে বর্ণাশ্রম ধর্মের অনুশীলন করলেও ধীরে ধীরে ভগবৎ ভক্তির সিদ্ধ অবস্থা লাভ করা যায়। কিন্তু যথার্থ আচার্যগণ এই মতবাদ স্বীকার করেন নাই। এমনকি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবৎ ভক্তির ক্রমোন্নতি সম্পর্কে রায় রামানন্দের সাথে আলাপ করার সময় এরূপ মতবাদ সমর্থন করেন নাই। রায় রামানন্দ যখন বর্ণাশ্রম ধর্মের গুরুত্ব বর্ণনা করছিলেন তখন মহাপ্রভু তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে বর্ণাশ্রম ধর্মের অনুশীলন হল বাহ্যিক—অর্থাৎ দৈহিক, সেটি অন্তরঙ্গ বা আধ্যাত্মিক নয়। ভগবদ্ গীতায় ভগবান স্বয়ং বলেছেন, **সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরনং ব্রজ**—অর্থাৎ সব ধরনের জড় জাগতিক কার্যকলাপ ত্যাগ করে আমার শরণ নিলেই হবে। কাজেই কেবলমাত্র বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করলেই ভক্তিমার্গের সিদ্ধ অবস্থায় পৌছানো সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন ভগবানের কাছে পূর্ণমাত্রায় আত্মসমর্পণ।

প্রশ্ন : ৮৬৯ ॥ জপ, কীর্তন এবং সংকীর্তনের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : মৃদু স্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করাকে জপ বলে। উচ্চস্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করাকে বলা হয় কীর্তন। পক্ষান্তরে সমবেতভাবে উচ্চস্বরে

ভগবানের লীলা, গুণ, রূপ ইত্যাদির মহিমা কীর্তন করলে তাকে বলা হয় সংকীর্তন। এককথায় সংকীর্তন বলতে সমবেতভাবে ভগবানের দিব্যনাম কীর্তনকে বোঝায়।

জপের ফলে কেবল জপকারীর নিজেরই লাভ হয়। কিন্তু কীর্তন এবং সংকীর্তনের ফলে শ্রবণকারীসহ সকলেরই কল্যাণ হয়। **পদ্মপুরাণে** বলা হয়েছে "যে মানুষ ভগবানের দিব্য নাম জপ অথবা কীর্তন করেন তাঁর কাছে স্বর্গের সুখ এবং মুক্তির লাভের উপায় তৎক্ষণাৎ উন্মুক্ত হয়।"

প্রশ্ন : ৮৭০ ॥ ভগবানের পাদপদ্মে আত্মনিবেদনের কথা শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। এই আত্মনিবেদনের উপায় কি?

উত্তর : স্কন্দপুরানে ভগবানের পাদপদ্মে আত্মনিবেদনের ব্যাপারে তিনটি উপায়ের কথা বলা হয়েছে।

১. সম্প্রার্থ নাসিকা—অর্থাৎ গভীর আবেগ বা ভক্তির সাথে ভগবানের শরণাগত হওয়া।

২. দৈন্যবোধিকা—অর্থাৎ দীনহীনভাবে ভগবানের শরণাগত হওয়া।

৩. লালসাময়ী—অর্থাৎ সিদ্ধি লাভের অভিলাষী হওয়া। এরূপ প্রচেষ্টা ইন্দ্রিয় তৃপ্তি নয়।

কোন মানুষ যখন পরমেশ্বর ভগবানের সাথে তার নিত্য সম্পর্কের কথা জানতে পারেন তখন তিনি বুঝতে পারেন যে শ্রীকৃষ্ণের দাসরূপে, সখারূপে, পিতা-মাতারূপে অথবা প্রেমিকারূপে তার যে পরিচয়, তাই হল যথার্থ স্বরূপ। একে বলা হয় লালসাময়ী—অর্থাৎ নিজের যথার্থস্বরূপে অধিষ্ঠিত হওয়ার একান্ত বাসনা। আত্মনিবেদনের এই লালসাময়ী স্তর হল যথার্থ মুক্তির স্তর যাকে বলা হয় স্বরূপ সিদ্ধি। মানুষ তখন আত্মজ্ঞান লাভ করে পরমেশ্বর ভগবানের সাথে তার যথার্থ সম্পর্কের কথা জানতে পারে।

লেখক পরিচিতি

শ্রী মনোরঞ্জন দে মুন্সীগঞ্জ জেলার অর্ন্তগত সিরাজদিখান উপজেলার রাজদিয়া গ্রামের এক বর্ধিষ্ণু কায়স্থ পরিবারে ১৯৫১ সালের ২রা জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। মা-বাবা ধর্মপরায়ণ ছিলেন। বাড়ীতে শ্রী রাধাকৃষ্ণের মন্দির থাকায় ছোটবেলা থেকেই শ্রী বিগ্রহদ্বয়ের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। লেখাপড়া করেছেন নিজ গ্রামের রাজদিয়া অভয় উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রথমে কিছুদিন কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। এরপর বাংলাদেশ ব্যাংক ও পরবর্তীতে অগ্রণী ব্যাংকে উচ্চ পদস্থ ব্যাংকার (সহকারী মহাব্যবস্থাপক) হিসেবে কাজ করেছেন। বি. এ (পাস), বি. এস. এস (সম্মান) এবং এম. এস. এস শ্রেণীতে অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর বই লিখেছেন ২৫টি।

শ্রী মনোরঞ্জন দে বিভিন্ন সময়ে সনাতন ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ের উপর অনেক নিবন্ধ লিখেছেন এবং এখনও লিখেছেন। বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতির মাসিক পত্রিকা "সমাজ দর্পণ এবং ইস্‌কন কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক "হয়েকৃষ্ণ সমাচার" এবং ত্রৈমাসিক "অমৃতের সন্ধানে" পত্রিকায় এ পর্যন্ত তার লিখিত বহু ধর্মীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি একজন সৌখিন হস্তরেখাবিদ।